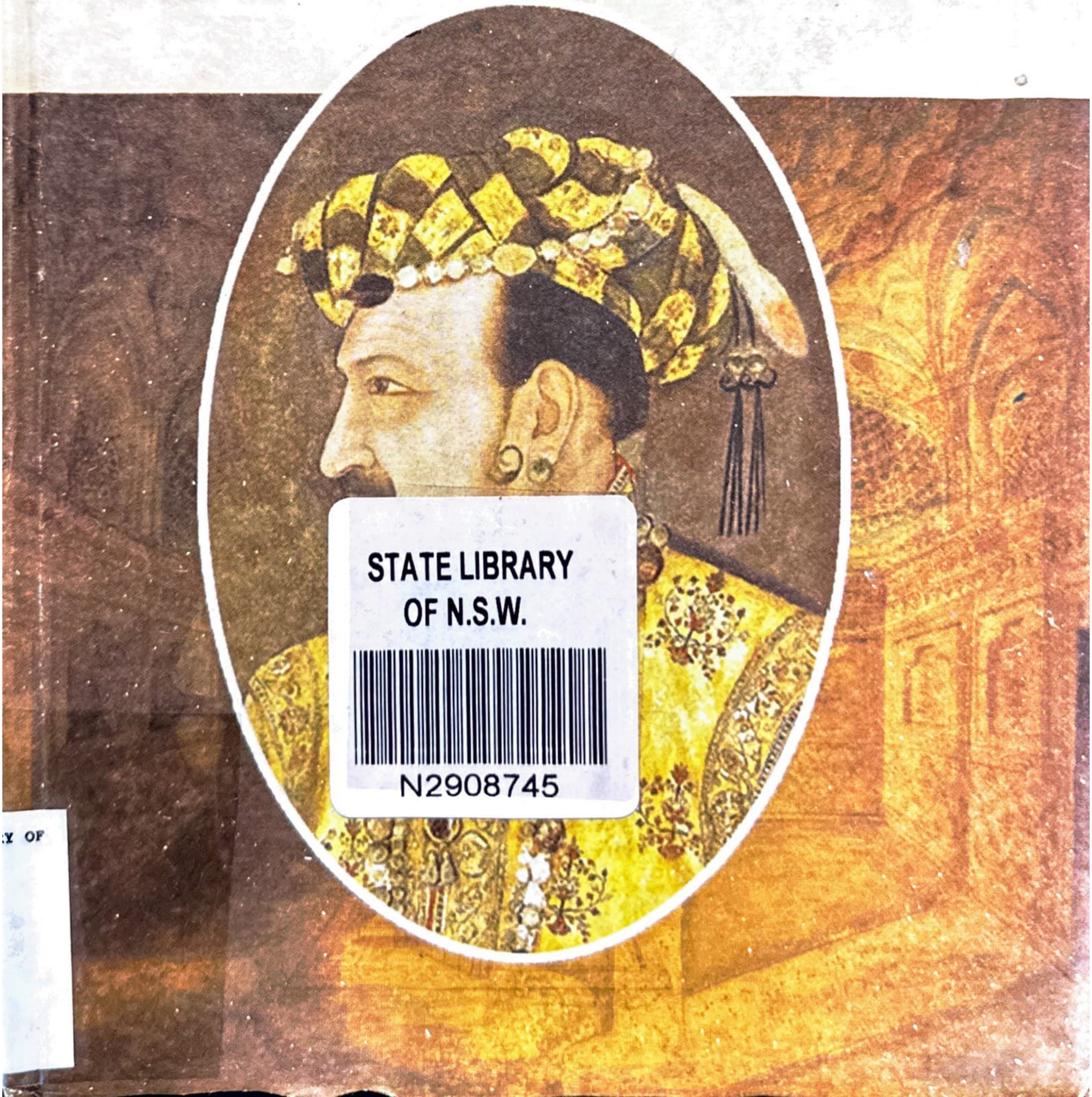
ইকবালনামা-ই জাহাঙ্গীরী

মূল: মু'তামাদ খান

অনুবাদ: মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ





ইকবালনামা-ই জাহাঙ্গীরী

ইকবালনামা-ই জাহাঙ্গীরী

মূলঃ মু'তামাদ খান

অনুবাদঃ মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ



প্রকাশনার ছয় দশকে
স্টুডেন্ট ওয়েজ

প্রকাশক
মোহাম্মদ লিয়াকতউল্লাহ
স্টুডেন্ট ওয়েজ
লিয়াকত প্লাজা
৯ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
দূরভাষ : [+৮৮] ০২৭১২১ ৫৬৮
ই-মেইল : studentways@hotmail.com
ওয়েব : www.studentways.info

প্রথম প্রকাশ
একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩
ফাল্গুন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

অনুবাদস্বত্ব
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রচ্ছদ
সহিদুল ইসলাম রনি

অক্ষর বিন্যাস
এস ওয়েজ কম্পিউটার
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে
মৌমিতা প্রিন্টার্স
প্যারিদাস রোড ঢাকা ১১০০

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com

মূল্য : একশত পঁয়ত্রিশ টাকা

ISBN : 978 984 406 657 3

IQBALNAMA-E- JAHANGIRE : biography of Empire Jahangir Translated by Mohammad Mamunur Rashid. Published by Mohammad Liaquatullah of Student Ways. 9 Banglabazar, Dhaka-1100. First Published : Ekushe Bookfair 2013. Price : One Hundred Thirty Five only .

উৎসর্গ

আমার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র-পুত্রি
ভাগ্নে-ভাগ্নিদেরকে

ভূমিকা

এই স্মৃতিকথার রচয়িতা নওয়াব মু'তামাদ খান সর্বসাধারণ্যে মোহাম্মদ শরীফ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে একজন বক্‌শী (paymaster) বা সেনাপতি ছিলেন। তিনি এক হাজারী মনসব পেয়েছিলেন। অর্থ্যাৎ তিনি এক হাজার সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন। সম্রাট তাঁকে সম্মানসূচক উপহার হিসাবে একটি হাতি দিয়েছিলেন।

ইকবালনামা তিনখণ্ডে রচিত। প্রথমখণ্ডে রয়েছে খাকান রাজবংশের ইতিহাস এবং বাবর ও হুমায়ুনের আমলও এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয়খণ্ডে রয়েছে আকবরের আমলের বর্ণনা এবং তৃতীয়খণ্ডে জাহাঙ্গীরের আমল। তৃতীয়খণ্ডটি ছাড়া অপর দু'টি খণ্ড খুব দুর্লভ। এখানে তৃতীয় খণ্ডেরই বাছাইকৃত অংশের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজত্ব করেছেন বাইশ বছর। তিনি একটি আত্মজীবনী লিখেছেন, যা 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' নামে পরিচিত। তবে তাতে তাঁর রাজত্বের পুরো বিবরণ নেই। রাজত্বের সপ্তদশবর্ষে সম্রাট জাহাঙ্গীর আত্মকথা লিখন বন্ধ করে দেন। অতঃপর সেই কাজ চালিয়ে নেবার দায়িত্বভার অর্পিত হয় মু'তামাদ খানের উপর। তাঁর উপর দায়িত্ব অর্পণ সম্পর্কে আত্মজীবনীতে সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজে বলেছেন, "দু'বছর আগে আমার দেহে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল এবং যা আজও রয়েছে। যার ফলে আমার মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্র সামঞ্জস্য রেখে কাজ করছে না। তার জন্য এই স্মৃতিকথার ঘটনাগুলি ঠিকমত লিখে উঠতে পারছিনা। এই রকম একটি সময় মু'তামাদ খান দাক্ষিণাত্য থেকে এসে আমার দরবারের দ্বারদেশ স্পর্শ করার সৌভাগ্য লাভ করলেন। তিনি এমন একজন কর্মচারী, যিনি আমার মন-মেজাজ ভালো জানেন ও আমার বক্তব্য ঠিক বুঝতে পারেন। ইতিপূর্বে কিছু কিছু লেখার ভার আমি তাঁর উপর দিয়েছিলাম। এখন আমি হুকুম দিলাম যে ঐদিন থেকে আমি নিজে যতটা লিখেছি তারপরে তিনি লিখে দেবেন আমার এই স্মৃতিকথার অংশ হিসাবে। এই সময় থেকে যা যা হবে ও ঘটবে তা তিনি রোজনামচার মত লিখে রাখবেন এবং আমাকে দেখাবেন তার যথার্থ বিচার করার জন্য। আমি অনুমোদন করলে তবে তা পুঁথিতে লিপিবদ্ধ হবে।"

মু'তামাদ খান সম্রাটের রাজত্বের উনিশ বছরের শুরু থেকে বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু এর পরে সম্রাটের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ তিনি যা লিখেছেন তা তাঁর (মু'তামাদ) নিজস্ব বক্তব্য। সম্রাট তাঁকে সবসময় কাজ চালিয়ে যেতে বলতেন। লেখক নিজে সেসময় বড় একটি পদে নিয়োজিত ছিলেন, তাই

বিভিন্ন ঘটনায় তিনিও জড়িত ছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলের তিনি একজন বড় প্রত্যক্ষদর্শী। গ্রন্থটি তিনি ফার্সীতে রচনা করেছিলেন। এরপর এটি উর্দূতে পদ্যের আকারে অনুদিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রফেসর ডাউসন এটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন, তবে পুরো গ্রন্থ নয়, বইটির আকর্ষণীয় উল্লেখযোগ্য অংশ। সেই ইংরেজী অনুবাদ থেকেই বাংলায় ভাষান্তর করা হয়েছে। ডাউসন সম্পাদিত 'History of India as told by its own historians' গ্রন্থে এটি স্থান পেয়েছে। তবে ইংরেজী গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য। এই গ্রন্থে মু'তামাদ খানের নিজস্ব বক্তব্যের অংশটুকর অনুবাদ করা হয়েছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের জবানীতে তাঁর রাজত্বের উনিশ বছরের বিবরণের অংশটুকু এখানে স্থান পায়নি। এছাড়াও এটি পুরো ইকবালনামা'র অনুবাদ নয়, নির্বাচিত অংশ মাত্র। সনামধন্য প্রকাশনী স্টুডেন্ট ওয়েজ এর কর্ণধার শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ লিয়াকতউল্লাহ ভাই আগ্রহ দেখানোর ফলে বইটি আলোর মুখ দেখছে। বইয়ের জগতের প্রতি তাঁর কেবল কমিটমেন্টের কারণেই ইতিহাসের পাঠক-পাঠিকারা একটি খোরাক পাচ্ছেন। এই বই অনুবাদে যদি কোন দুর্বলতা, ভুল-ভ্রান্তি থাকে, তার সমস্ত দায় আমার। আশাকরি পাঠক-পাঠিকারা সেটুকু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ছবি স্ক্যানিং, গেটআপ সেটআপ ঠিক করে দেয়াসহ কম্পিউটারে যাবতীয় টেকনিক্যাল কাজ করে দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছে আমার স্নেহাস্পদ ইয়াসিন আরাফাত, তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বইটি পাঠকালে পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্য এখানে সম্রাট নূর উদ্দিন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সেলিম সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু তথ্য দিয়ে দিচ্ছি। তিনি সম্রাট আকবরের সন্তান। আকবরের প্রধান স্ত্রী যোধা বাঈ এর গর্ভে ১৫৬৯ সালের ৩০ আগস্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যোধা বাঈ ছিলেন আম্বরের রাজা ভার মলের কন্যা। সম্রাট জাহাঙ্গীর ক্ষমতায় ছিলেন ১৬০৫ থেকে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সম্রাট আকবর ফতেহপুর সিক্রি থেকে তাঁর রাজধানী লাহোরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। ফতেহপুর সিক্রি ১৮ বছর মোগল রাজধানী ছিল। আমরা লাহোরকেই জাহাঙ্গীরের রাজধানী হিসাবে দেখতে পাই। সম্রাট আকবরের মৃত্যুশয্যাকালে সেনাপতি মানসিং সহ কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি আকবরের নাতি, অর্থ্যাৎ জাহাঙ্গীরেরই পুত্র খসরুকে আকবরের ক্ষমতার উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছিলেন। খসরু মানসিং এর ভাগ্নে, আম্বরের রাজা ভগবান দাসের কন্যা মান বাঈ এর পুত্র ছিলেন। যাইহোক মানসিংদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। জাহাঙ্গীর মসনদে বসার পরপরই খসরু বিদ্রোহী হয়েছিলেন। তাঁকে পরাজিত করে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের আরেক পুত্র খুররম, অর্থ্যাৎ শাহজাহানও পরবর্তীকালে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। খুররমকে অবশ্য জাহাঙ্গীর কোন শাস্তি দিতে পারেননি।

সম্রাট জাহাঙ্গীর অন্ততঃ কুড়িটি বিয়ে করেন। মান বাঈ ছিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রী। জাহাঙ্গীর তাঁর বয়স ১৬ বছর পূর্ণ হবার আগেই প্রথম বিয়ে করেন। সর্বশেষ স্ত্রী ছিলেন নূরজাহান। নূরজাহানের হাতে রাজ্য শাসনের সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়ে তিনি আফিম ও মদ নিয়ে সময় কাটাতেন। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে নিজে কোন যুদ্ধই করেননি। চিত্রকলা, কবিতা, গাছপালা, ফুল, বাগান, বিচিত্র পশু-পাখি'র প্রতি তাঁর খুব আকর্ষণ ছিল। তিনি আজব আজব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পছন্দ করতেন। যেমন, কোন মানুষকে মেশকে আম্বর খাইয়ে তার উপর কি প্রতিক্রিয়া হয় তা পর্যবেক্ষণ করা।

মহাব্বত খান ছিলেন তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি। সম্রাটের কাছ থেকে অনেক অনেক অনুগ্রহ পেয়ে ধন্য হয়েছেন মহাব্বত খান এবং তাঁর পুত্ররা। কিন্তু নূরজাহান এবং তাঁর ভাই আসফ খানের সাথে বিরোধের কারণে মহাব্বত খান পরবর্তীতে বিদ্রোহী হন। বিশেষকরে নূরজাহানকে সম্রাট কর্তৃক সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান মেনে নিতে পারেননি মহাব্বত খান। স্ত্রী'র হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সম্রাট নিজে স্ত্রৈন'র মত জীবন কাটালে ভবিষ্যতের সম্রাটরা এ নিয়ে কি ভাববে? – অর্থ্যাৎ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করবে কিনা – এ প্রশ্ন তুলেছিলেন মহাব্বত খান। সে আমলের রচিত 'ইন্তিখাব-ই জাহাঙ্গীর শাহী' তে এ তথ্য উল্লেখ রয়েছে। মহাব্বত খান এক পর্যায়ে বন্দী খসরুকে মুক্ত করে ক্ষমতায় বসানোরও চিন্তাভাবনা করেছিলেন। কারণ খসরুকে পরাজিত করা এবং অন্ধ করে দিয়ে বন্দী করে রাখার নির্মম কাজটা এই মহাব্বত খানকে দিয়েই সম্রাট করিয়েছিলেন। সম্রাটের কানে এসব খবর পৌঁছে গিয়েছিল। তবে মহাব্বত খান তাঁর অবস্থানে অনড় ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "সম্রাট আমার কথা মানুন, বা না মানুন, আমার বিবেক যা সায় দিয়েছে আমি তা বলেছি"। পরে সম্রাটের অনুমতি না নিয়ে মহাব্বত খান খাজা ওমর নকশবন্দীর পুত্রের সাথে তাঁর কন্যার বিয়ে দেয়ায় সম্রাট ক্ষুব্ধ হয়ে সেই কন্যা জামাতাকে বন্দী করে এনে বেদম বেত্রাঘাত করান। এছাড়াও তাদেরকে নানাভাবে নির্মম শাস্তির সম্মুখীন করা হয় এবং জামাতা খাজা বরখুরদারকে বন্দী করে রাখা হয়। যা মহাব্বত খানকেও চরম ক্ষুব্ধ করে তোলে। যার পরিণতিতে মহাব্বত খান সম্রাটকে কৌশলে অপহরণ করে কাবুল নিয়ে যান এবং বহুদিন বন্দী করে রাখেন। পরে সম্রাট পালিয়ে আসতে সক্ষম হন।

–মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম বৎসর

৯ই সফর সম্রাট লাহোর পৌছেন। খসরুকে একটি হাতীর পিঠে তুলে খুঁটিগুলোর (যেখানে শূলবিদ্ধ করা হয়েছিল তাঁর অনুসারীদেরকে) মাঝখান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে তিনি তাদের কি ধরনের শাস্তি হয়েছিল তা দেখতে পান এবং তাঁর মন্দ পথের ব্যাপারে সাবধান হন।[১]



সম্রাট জাহাঙ্গীর

রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসর

নূরজাহানের স্বামী শের-আফগানের মৃত্যু

বাংলা থেকে খবর আসে যে, কুতুব উদ্দিন খান এবং বহু রাজকীয় কর্মকর্তাকে শের-আফগান খেতাবপ্রাপ্ত আলী কুলি বেগ ইসতাজলু হত্যা করেছেন – যারাই

তাঁর সামনে পড়েছেন। আলী কুলি ছিলেন শাহ তাহমাস্প সাফাভীর পুত্র শাহ ইসমাঈলের প্রধান খাদ্য পরিবেশক। শাহ ইসমাঈলের মৃত্যুর পর তিনি কান্দাহারের পথ ধরে হিন্দুস্তানে চলে আসেন এবং মুলতানে খান-খানানের সাথে যোগ দেন। খান-খানান (বৈরাম খান) তখন থাট্টার বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়েছিলেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আলী কুলিকে রাজকীয় চাকুরীতে নিয়োগ করেন এবং অভিযানকালে আলী কুলি তাঁর সক্ষমতা ও সাহস প্রদর্শন করেন এবং কাজকর্ম ভালোভাবেই সম্পন্ন করেন। বিজয়ী হয়ে অভিযান থেকে ফিরে খান-খানান তাঁর (আলী কুলির) কর্মকাণ্ডের বিবরণ (লিখিত রিপোর্ট) প্রেরণ করেন এবং তাঁকে একটি চমৎকার মনসব পাইয়ে দেন। সে সময়ের দিকে মীর্জা গিয়াস বেগের কন্যাকে তাঁর কাছে বিয়ে দেয়া হয়। সম্রাট আকবর যখন আগ্রা থেকে দক্ষিণের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন মসনদের হবু উত্তরাধিকারী শাহজাদা সেলিমকে (পরবর্তীকালের সম্রাট জাহাঙ্গীরকে) রাণার বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠানো হয়। আলী কুলি বেগকে তখন শাহজাদার সহযোগী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। তিনি শাহজাদার নেকনজর লাভ করেন এবং শের-আফগান খেতাব পান। জাহাঙ্গীরের (সেলিম) সিংহাসন আরোহণের সাথে সাথে শের আফগানের জায়গীরও সুনিশ্চিত করা হয় এবং তাঁকে বাংলায় প্রেরণ করা হয়। পরে খবর পাওয়া যায় যে, তিনি অবাধ্য এবং বিদ্রোহী ভাবাপন্ন। কুতুব উদ্দিনকে যখন বাংলায় পাঠানো হয় তখন তাঁকে শের-আফগানের ব্যাপারটা দেখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, যদি তাঁকে অনুগত ও কর্তব্যনিষ্ঠ হিসাবে পাওয়া যায় তাহলে তাঁকে যেন তাঁর জায়গীরে বহাল রাখা হয়, আর যদি তাঁকে সে অবস্থায় পাওয়া না যায় তাহলে যেন তাঁকে দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হয়, অথবা যদি তিনি দরবারে যেতে বিলম্ব করেন তাহলে যেন তাঁকে শাস্তি দেয়া হয়। তাঁর কার্যকলাপ ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে কুতুব উদ্দিন খারাপ তথ্য পান। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে যখন রাজার প্রতিনিধির (কুতুব উদ্দিনের) সামনে হাজির হতে ডেকে পাঠানো হয় তখন হাজির না হবার জন্য তিনি অযৌক্তিক বাহানা দেখান এবং বদমতলব আঁটতে থাকেন। তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে কুতুব উদ্দিন সম্রাটের কাছে লিখিত বিবরণ পাঠান এবং তাঁকে দরবারে পাঠিয়ে দেবার জন্য রাজকীয় আদেশ দেয়া হয়। রাজপ্রতিনিধি (স্থানীয় শাসক)কে আরো আদেশ দেয়া হয় যে, তিনি যে নির্দেশ লাভ করেছেন তা যেন কার্যকর করেন এবং শের-আফগান যদি আরো কোন আনুগত্যহীনতা প্রদর্শন করেন তাহলে তাঁকে যেন শাস্তি দেন। এই আদেশ লাভ করার পর কুতুব উদ্দিন সাথে সাথে শের-আফগানের জায়গীর বর্ধমানের পথে রওনা হন। কাছাকাছি পৌছলে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য শের আফগান তাঁর দু'জন অনুগামীকে নিয়ে এগিয়ে আসেন। কুতুব উদ্দিনের লোকেরা

তখন শের-আফগানকে ঘিরে অবস্থান নেয়। কুতুব উদ্দিনের এই ব্যবস্থা দেখে শের-আফগানের সন্দেহ জাগে, তাই তিনি শান্তস্বরে জানতে চান এইসব কার্যকলাপের অর্থ কি। কুতুব উদ্দিন তাঁর লোকদেরকে শের আফগানের আরো কাছে যেতে নিষেধ করেন এবং তিনি নিজে শের আফগানের কাছে গিয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা চালাতে থাকেন। শের-আফগান বুঝতে পারেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে কোন পরিকল্পনা আঁটা হয়েছে। অতঃপর তিনি তাঁর তরবারী বের করেন এবং কেউ হস্তক্ষেপ করার আগেই সেটি কুতুব উদ্দিনের পেটে ঢুকিয়ে দেন, ফলে কুতুব উদ্দিনের নাড়িভুড়ি বের হয়ে আসে। কুতুব উদ্দিন দু'হাত দিয়ে তাঁর পেট চেপে ধরে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকেন, হত্যাকারীকে পালাতে দিও না। পীর খান কাশ্মীরী নামে এক সাহসী কর্মকর্তা (সেনাধিপতি) ত্বরিৎগতিতে শের-আফগানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তরবারী দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেন কিন্তু শের-আফগান এমন এক ভয়ংকর প্রতিঘাত করেন যে, সেই আঘাতেই তাঁর হত্যাকারী নিহত হন। কুতুব উদ্দিনের অন্যান্য অনুগামীরা এ সময় সামনে এগিয়ে এসে তাঁদের তরবারীর দ্বারা শের-আফগানকে পরপারে পাঠিয়ে দেন।



পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্রাট

রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসর

নূরজাহানের সাথে জাহাঙ্গীরের বিয়ে

এই মধ্যবর্তী সময়ে যত ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল নূরজাহানকে বিয়ে করার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের আকাঙ্ক্ষা। এই বিষয়টা নিয়ে কয়েক খণ্ড পুস্তক রচনা করা যেতে পারে, কিন্তু আমরা সীমিত পরিসরের হাতে বন্দী, তাই ভাগ্যের এই বিচিত্রলিপি এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই বর্ণনা করছি। তেহরানের স্থানীয় বাসিন্দা খাজা মুহাম্মদ শরীফের পুত্র মীর্জা গিয়াস বেগ। খাজা মুহাম্মদ সর্বপ্রথম খোরাসানের প্রশাসক মুহাম্মদ খান টাকলুর উজির ছিলেন। মুহাম্মদ খানের মৃত্যুর পর তিনি খ্যাতিমান বাদশা তাহমাস্প সাফাভীর অধীনে চাকুরীতে যোগ দেন এবং তাঁকে ইয়াজ্‌দ এর উজিরের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। খাজার ছিল দু'পুত্র, আকা তাহির এবং মীর্জা গিয়াস বেগ। খাজা তাঁর দ্বিতীয় পুত্র'র জন্য আকা মুল্লা'র পিতা মীর্জা আলা উদ দীনের কন্যার পাণিপ্রার্থনা করেন। পিতার মৃত্যুর পর মীর্জা গিয়াস বেগ তাঁর দু'পুত্র এবং এক কন্যাকে নিয়ে হিন্দুস্তানের পথে রওনা দেন। সড়ক পথে কান্দাহারের মধ্যদিয়ে যাবার সময় আল্লাহর রহমতে তাঁর আরেক কন্যার জন্ম হয়। ফতেহপুর নগরীতে সম্রাট আকবরের কাছে হাজির হবার পর তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল সৌভাগ্য। অল্প সময়ের মধ্যে সম্রাটের চাকুরীতে তাঁর নিষ্ঠা এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তার ফলে মীর্জা গিয়াস বেগ দিওয়ান, অর্থ্যাৎ সম্রাটের গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক পদে উন্নীত হন। লেখায় এবং কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিনি অতিশয় চালাক ও দক্ষ হিসাবে প্রতিভাত হন। তিনি প্রাচীন কবিতা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন এবং শব্দার্থের চমৎকার মূল্যায়ণ তিনি করতে পারতেন এবং তিনি স্পষ্ট ও মার্জিত রীতিতে শিকস্তা লিখেছিলেন। অবসর সময়ে তিনি কবিতা ও তার রীতি নিয়ে পড়াশোনায় নিমগ্ন থাকতেন। দরিদ্রদের প্রতি তাঁর দানশীলতা ও দয়া এমনই ছিল যে, কেউ কখনো তাঁর দরজা থেকে হতাশ হয়ে ফিরে আসেনি।

মহামান্য সম্রাট আকবর যখন লাহোরে অবস্থান করছিলেন, তখন আলী কুলি বেগ ইসতাজলু – যিনি বেড়ে উঠেছিলেন শাহ ইসমাঈলের অধীনে – ইরাক রাজ্য থেকে এসেছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক রাজকীয় কর্মচারীর মধ্যে অন্যতম হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন এবং বিধির বিধান অনুসারে কান্দাহারে জন্ম নেয়া মীর্জা

গিয়াস বেগের সেই কন্যাকে বিয়ে করেন। পরবর্তীতে জাহাঙ্গীরের আমলে আলী কুলি ইসতাজলু একটি উপযুক্ত মনসব লাভ করেন এবং তাঁকে শের-আফগান খেতাব দেয়া হয়। এরপর তিনি বাংলা প্রদেশে একটি জায়গীর পেয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য সেখানে চলে যান। তাঁর হাতে কুতুব উদ্দিন খানের হত্যাকাণ্ড এবং তাঁর নিজের মৃত্যুর বিবরণ ইতিমধ্যে বর্ণনা করেছি। কুতুব উদ্দিনের মৃত্যুর পর বাংলার কর্মকর্তারা রাজকীয় আদেশের প্রতি আনুগত্য সরূপ গিয়াস বেগের কন্যাকে দরবারে পাঠিয়ে দেন। গিয়াস বেগ 'ইতিমাদ-উদ-দৌলা' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। কুতুব উদ্দিনের হত্যাকাণ্ডে খুবই মুহ্যমান সম্রাট সেই কন্যাকে হেরেমে স্থান দেন এবং তাঁর আপন মাতার (রাজমাতা) দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করেন সেই কন্যার ওপর।



একজন ব্রাহ্মণকে দান করছেন সম্রাটের বেগম

কোন ধরনের সাড়াশব্দ ছাড়াই সেই কন্যা কিছুকাল সেখানেই অবস্থান করেন। অতঃপর বিধির বিধান স্থির হল যে, সেই কন্যা বিশ্বরানী এবং সে সময়ের

বাদশা'র বেগম হবেন। যে ঘটনা ঘটলো তা হল, সম্রাটের রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসর নওরোজ (নববর্ষ) উৎসবের দিন সেই কন্যার উপস্থিতি সম্রাটের দূরদর্শী চক্ষে ধরা দেয় এবং তাঁকে এতটাই মুগ্ধ করে যে, তিনি তাঁর পছন্দের হারেমের বাসিনীদের মধ্যে সেই কন্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। দিনে দিনে তাঁর প্রভাব এবং মর্যাদা বাড়তে থাকে। সর্বপ্রথম তিনি 'নূর মহল' বা 'হারেমের আলো' খেতাব পান, কিন্তু পরে তাঁকে সবার থেকে আলাদা করে 'নূরজাহান বেগম' বা 'বিশ্বের আলো' খেতাবে ভূষিত করা হয়। তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজনকেও সম্মান ও সম্পদে উন্নীত করা হয়। তাঁর মোহর (সীল) ছাড়া কোন নারীকে কোন ভূখণ্ড মঞ্জুর করা হত না। অন্যান্য বাদশাদের মত নূরজাহানকে খেতাব দেয়া ছাড়াও তাঁকে সম্রাট সার্বভৌমত্ব (সর্বময় ক্ষমতা) ও সরকার পরিচালনার অধিকারও মঞ্জুর করেন। নূরজাহান কখনো কখনো তাঁর প্রাসাদের ঝুল বারান্দায় বসতেন, সে সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত হতেন এবং আদেশ গ্রহণ করতেন। তাঁর নামে মূদ্রা অংকিত করা হয়, যার উপরে লেখা হয়, "সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে অংকিত এই স্বর্ণমূদ্রা রানী বেগম নূরজাহানএর নামের প্রভাবে শত প্রভায় দীপ্তিময়।" সকল ফরমানেও রাজকীয় স্বাক্ষরে "রানী বেগম নূরজাহান" এই নামটি সম্রাটের নামের পাশে যৌথভাবে সংযুক্ত করা হচ্ছিল। সবশেষে তাঁর কর্তৃত্ব এমন এক পর্যায়ে পৌঁছলো যে, সম্রাট কেবল নামেই রইলেন। বারবার তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি নূরজাহান বেগমের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছেন এবং তিনি বলতেন, "এক সের মদ এবং আধা সের মাংশ ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না।

রানীর সৌন্দর্য এবং বিচক্ষণতা বর্ণনা করা অসম্ভব। যদি কোন বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়, আর তা তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে তিনি তা সাথে সাথে সমাধান করে দিতেন। তাঁর কাছে আশ্রয় নিয়ে যে কেউ অত্যাচার ও দমন-পীড়ন থেকে সুরক্ষা পেত। যদি তিনি কখনো জানতে পারতেন যে, কোন এতিম মেয়ে নিঃস্ব ও স্বজনবিহীন অবস্থায় রয়েছে, তাহলে তিনি সেই মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতেন এবং যৌতুক দিতেন। খুবসম্ভব, তার আমলে কমপক্ষে পাঁচশত এতিম মেয়ে এধরনের বিয়ে ও যৌতুকপ্রাপ্ত হয়েছে।

রাজত্বের একাদশ বৎসর

মহামারী

এই বৎসর হিন্দুস্তানের কিছু অংশে মহামারী দেখা দেয় এবং এটা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই ভয়াবহ বিপদ উদ্ভুত হয়েছিল পাঞ্জাবের পরগনাগুলোতে। এটা লাহোর পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং বহুসংখ্যক মুসলমান ও হিন্দু এতে প্রাণ হারায়। এ মহামারী এরপর সিরহিন্দের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং দোয়াবের মধ্য দিয়ে দিল্লী এবং চারপাশের এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে দেশটির ঐসব অংশের বহু গ্রাম ও পরগনা ধ্বংস হয়ে যায়।



দরবারে বসে আছেন সম্রাট জাহাঙ্গীর সেলিম।

এ রোগটা ছড়ায় ইঁদুরের দ্বারা। একটি ইঁদুর পাগল হয়ে গেলে সে তার গর্ত থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে আসে এবং কোন বাড়ীর দরজা ও দেয়ালে গিয়ে আছড়ে

আছড়ে পড়ে, এরপর মারা যায়। যদি এ ধরনের ঘটনার আলামত দেখতে পেয়ে ঐ বাড়ীর বাসিন্দারা বাড়ী ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায় তাহলে তারা প্রাণে রক্ষা পায়। যদি তা না করে তাহলে পুরো গ্রামের লোকেরা মৃত্যুর কবলে পড়ে সাফ হয়ে যায়। যদি কোন লোক এ ধরনের রোগে মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করে, অথবা এমনকি মৃত ব্যক্তির কাপড়ও স্পর্শ করে তাহলে সেই লোকও এই মারাত্মক সংক্রামণ থেকে রক্ষা পায় না। এই মহামারীর প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশী মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছিল হিন্দুদের মাঝে। লাহোরে এর ধ্বংসযজ্ঞ এতবেশী ছিল যে, একই বাড়ীতে দশ জন বা এমনকি বারো জন পর্যন্ত প্রাণ হারায় এবং তাদের বেঁচে থাকা প্রতিবেশীরা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে চলে যায়। বাড়ীগুলোকে লাশে পরিপূর্ণ অবস্থায় বন্ধ করে রেখে লোকজন চলে যায় এবং নিজেদের প্রাণের আশংকায় কেউই ঐসব বাড়ীর কাছেও যাবার সাহস দেখাতে পারেনি। কাশ্মীরেও এর মারাত্মক প্রকোপ হয়েছিল। সেখানে এর প্রভাব এত ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছিল যে, (উদাহরণ সরূপ) একজন দরবেশ আজ তাঁর একজন স্বজনের লাশকে শেষ গোসল দিলেন, আর পরদিন তিনিও সেই একই দুর্ভাগ্য বরণ করলেন। সেই মৃতলোককে যেখানটায় গোসল দেয়া হয়েছিল সেখানকার ঘাষ খেয়ে একটি গরুও মারা গেল। সেই মৃত গরুর মাংশ খেয়ে একটি কুকুরও সাথে সাথে মরে গেল। এই দুর্দৈব থেকে হিন্দুস্তানের কোন স্থানই রেহাই পায়নি। এই মহামারী আট বছর ধরে দেশটিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসর

একদিন ভোর হবার সোয়া এক ঘণ্টা পূর্বে বায়ুমণ্ডলে (আকাশে) থামের মত একটি বাস্পীয় বস্তুর আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তী প্রত্যেক রাতের আধা ঘণ্টা আগে এটি আকাশে দেখা দিত। যখন এটি পূর্ণাকৃতিতে দেখা দিলো তখন এটি বর্শার রূপ ধারণ করলো। এটির দুই প্রান্ত হাল্কা ধরনের এবং মাঝখানটায় ঘন ও কাস্তের মত বাঁকানো। এর পেছনের অংশ দক্ষিণের দিকে এবং মুখটা উত্তর দিকে। জ্যোতির্বিদরা তাঁদের গণনার দ্বারা এর পরিমাপ করেছেন এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণের সাথে তুলনা করে দেখা যায় যে, এটি ২৪ ধাপের (ডিগ্রীর) বেশী বিস্তৃত। এটি আকাশের খুবই উচ্চে বিচরণ করছিল, তবে তার নিজস্ব একটি গতিপথ ছিল। তাই এটি প্রথমে বৃশ্চিক রাশিতে উদিত হলেও, পরে এটি অল্প সময়ের মধ্যে সেখান থেকে সরে গিয়ে তুলা রাশিতে প্রবেশ করে। এছাড়াও এটি দক্ষিণাভিমুখে ক্রমান্বয়ে হারিয়ে (ক্ষয়) যাচ্ছিল। জ্যোতির্বিদরা তাঁদের বইতে একটি বর্শার শিরোনামে এধরনের একটি বিস্ময়কর বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন। এটি দেখা দেবার পর ষোড়শ রজনীতে সেই একই স্থানে একটি তারকা দেখা দেয়, যার শীর্ষদেশ (মাথা) অত্যন্ত জ্বল জ্বল করছিল, তবে এর দুই বা তিন গজ লম্বা শেষের (লেজ) দিকটি ছিল নিস্প্রভ। এটি দেখা দেয়ার ফলসরূপ এই ব্যাপক-বিস্তৃত হিন্দুস্তান জুড়ে একটি মহামারীর গোলযোগ দেখা দেয়। যা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে ধরনের সবকিছুই অতীত যুগের লোকদের জানা ছিল এবং তারা লিপিবদ্ধও করে গেছেন, কিন্তু হিন্দুদের বিশ্বাসযোগ্য কোন গ্রন্থেই এ ধরনের কোন ঘটনার উল্লেখ নেই।[২] এই বিস্ময়কর বস্তু দেখা দেয়ার এক বৎসর পূর্বে মহামারী দেখা দিয়েছিল এবং অব্যাহত ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে আট বৎসর ধরে। এছাড়াও এই বিস্ময়কর বস্তুর প্রভাবের মাধ্যমেই মহামান্য সম্রাট এবং সৌভাগ্যবান শাহজাদা শাহজাহানের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এইসব গোলযোগ – যা শুরু হয়েছিল – তা স্থায়ী হয়েছিল সাত বা আট বৎসর। এই দেশে কত রক্ত ঝরলো ! এবং কত কত পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল !

এই সময় কান্দাহারের প্রশাসক (গভর্ণর) বাহাদুর খানের আবেদনপত্র থেকে জানা যায় যে, নগরীর চতুস্পার্শ্বে এবং অধীনস্ত এলাকাগুলোতে ইঁদুরের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তারা শস্য বা ফল-মূল যাইহোক কোনকিছুর চিহ্নও অবশিষ্ট রাখছে না। অনেক কষ্ট করে কৃষকরা উৎপাদনের চারভাগের একভাগই

কেবল রক্ষা করতে পেরেছে। একইভাবে তরমুজক্ষেত ও ঘেরা দেয়া ফলের বাগান এবং আঙুর বাগান সবই পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। বাগান ও ক্ষেতগুলোতে যখন আর কোন ফল ও শস্য অবশিষ্ট থাকলো না, তখন পর্যায়ক্রমে ইঁদুরগুলো সব মরে গেল।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের উনিশতম বৎসর

শাহজাহানের বিদ্রোহ

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের উনিশতম বৎসর শুরু হল। উড়িষ্যা ও বাংলা অভিমুখে শাহজাহানের সৈন্যবাহিনীর এগিয়ে যাবার (পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে) খবর নিশ্চিত হওয়া গেল। শাহজাদা পারভেজ ও মহাব্বত খানের কাছে একটি আদেশ পাঠানো হল যে, তাঁরা যেন দক্ষিণের নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন এবং এরপর ইলাহাবাস (ইলাহাবাদের পূর্ব নাম) ও বিহারের দিকে রওনা দেন, যাতে বাংলার প্রশাসক বিদ্রোহী শাহজাদা শাহজাহানের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হলে শাহজাদা পারভেজ রাজকীয় বাহিনী নিয়ে মোকাবেলা করতে সেখানে যেতে পারেন। এছাড়াও খান জাহানকে সম্রাট রাজধানীর দিকে পাঠান, যাতে তিনি পরিস্থিতির উপর নজর রাখেন এবং প্রয়োজন মনে করলে ঐ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।



পিতা সম্রাট আকবরের ছবি হাতে

বুরহানপুর থেকে মহাব্বত খান একজন দূত পাঠান আদিল খানের কাছে। আদিল খান লিখে জবাব দেন যে, তিনি দিওয়াল-গনৌতে মহাব্বত খানের সাথে দেখা করবেন এবং তাঁর পুত্রকে রাজকীয় চাকুরীতে প্রবেশ করাবেন। দূতও লিখে জানায় যে, আদিল খান অনুগত এবং তিনি তাঁর মন্ত্রী মোল্লা মোহাম্মদ লারিকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহীসহ মহাব্বত খানের কাছে পাঠাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বারবার ফরমান পাবার পরিপ্রেক্ষিতে সে অনুসারে শাহজাদা (পারভেজ) বাংলার দিকে রওনা দেন, যদিও মালওয়ায় প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং কর্দমের কারণে মারাত্মক অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। শাহজাদার অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে প্রেরিত মহাব্বত খান বুরহানপুরে মোল্লা মোহাম্মদ লারির আগমনের জন্য অপেক্ষায় থাকেন।

ইব্রাহীম খানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও উড়িষ্যার প্রশাসক আহমদ বেগ খান ঘড়ার জমিদারদের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যখন শাহজাহানের সেখানে (উড়িষ্যায়) আগমনের খবর পান, তখন তিনি শংকিত হয়ে পশ্চাদপসারণ করে প্রশাসকের আবাসস্থল পিপলিতে চলে আসেন এবং সেখানে নিজের ধন-সম্পদ জোগাড় করে নিয়ে কটক চলে যান। বাংলার দিকে যেতে পিপলি থেকে কটকের দূরত্ব বারো ক্রোশ। কিন্তু তিনি এখানেও নিজেকে বিদ্রোহী শাহজাদার সামনে দাঁড়াতে সক্ষম বলে মনে করতে না পেরে বর্ধমানের দিকে চলে যান এবং জাফর বেগের ভ্রাতুষ্পুত্র সালিহ'র কাছে খবর পাঠান। আব্দুল্লাহ খানের (শাহজাহানের সেনাপতি) কাছ থেকে সালিহ একটি পত্র পেয়েছিলেন, যেটাতে সালিহকে দলে টানার প্রচেষ্টা ছিল। তবে সালিহ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বর্ধমানকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা মুড়ে ফেলেন।

ইব্রাহীম খান যখন হুমকীমূলক খবরা-খবর পাচ্ছিলেন, তখন যদিও তাঁর বাহিনী বিভিন্ন ঘাঁটিতে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় ছিল – তিনি পালিয়ে আকবর নগর (রাজমহল) চলে যান এবং লড়াইয়ের জন্য সেখানে সৈন্য ও গোলা-বারুদ সংগ্রহ করেন। এ সময় তিনি শাহজাহানের কাছ থেকে (তাঁর দলে যোগ দেয়ার প্রস্তাবসহ) একটি পত্র পান, কিন্তু জবাবে লিখে জানিয়ে দেন যে, তিনি তাঁর মালিকের (সম্রাটের) জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়া পর্যন্ত লড়াই করবেন। বিদ্রোহী শাহজাদার বাহিনী বর্ধমানে পৌঁছলে দূরদৃষ্টিহীন সালিহ এগিয়ে যান এবং তাচ্ছিল্যভরে বোকার মত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। আব্দুল্লাহ খান (শাহজাহানের সেনাপতি) তাঁকে খুব বেশী দয়া না দেখিয়ে দুর্গ দখল করে নেন এবং শীঘ্রই সেখানে দুর্দশা সৃষ্টি করেন। সালিহ যখন বুঝতে পারলেন রেহাই পাবার কোন আশা আর নেই, তখন তিনি খানের খোঁজে বাইরে বেরিয়ে আসেন। খান তাঁকে গলায় ফিতা দিয়ে বেঁধে শাহজাদার সামনে হাজির করেন। এভাবে এখানকার বাধা অপসারণ করে শাহজাদা আকবর নগরের দিকে যাত্রা করেন। ইব্রাহীম খানের প্রথম ইচ্ছা ছিল যে, তিনি আকবর নগর ধরে রাখবেন, কিন্তু দুর্গটি ছিল

বিশাল এবং তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল এটির নিরাপত্তা বিধান করার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাই তিনি তাঁর পুত্রের সমাধিসৌধে চলে যান, যার আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট, তবে অধিক নিরাপদ ছিল। বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে সৈন্যরা এখানে এসে তাঁর সাথে যোগ দেয়।

শাহজাহানের সৈন্যবাহিনী আকবর নগরে এসেই সেই সমাধিসৌধে হামলা চালায়। এসময় (যুদ্ধের প্রচণ্ডতার কারণে) তাঁর নিজ দলের মধ্যে ও প্রতিপক্ষের মধ্যে মৃত্যুর ব্যস্ততা খুব বেড়ে যায়। আহমদ বেগ খান (উড়িষ্যার প্রশাসক ও ইব্রাহীম খানের ভ্রাতুষ্পুত্র) এখানে আসেন এবং একটি পথ খুঁজে নিয়ে অবরুদ্ধ সেই সমাধিসৌধে ঢুকে পড়েন। তাঁর উপস্থিতি সৈন্যশিবিরকে দারুণভাবে উৎসাহিত করে। অবরুদ্ধ সৈন্যদের অনেকের স্ত্রী ও পরিবার-পরিজন নদীর ওপাড়ে অবস্থান করছিল। তাই (এটা জানতে পেরে) আব্দুল্লাহ খান ও দরিয়া খান আফগান (বিদ্রোহী শাহজাহানের দলের সেনাপতি) সেখানে অভিযান চালানোর জন্য নদী পাড়ি দেন। তাদের এই গতিবিধি ইব্রাহীম খানকে সতর্ক করে তোলে, তিনি আহমদ খান বেগকে সাথে নিয়ে দ্রুতগতিতে সেখানে চলে যান। অন্যদেরকে তাঁর সুরক্ষিত ঘাঁটির দায়িত্বে রেখে যান। শত্রুদের চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য তিনি অগ্রবর্তী হিসাবে কিছু যুদ্ধনৌযান – হিন্দি ভাষায় যেগুলোকে নওয়ারা বলে – পাঠিয়ে দেন। কিন্তু নৌযানগুলো এসে পৌঁছার আগেই দরিয়া খান নদী পাড়ি দিয়ে ফেলেন। এটা শুনে ইব্রাহীম খান নদীর উপর দিয়ে আহমদ বেগকে দরিয়া খানের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। আহমদ বেগ ওপাড়ে উঠার সাথে সাথে সেখানেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং তাঁর বহুলোকের প্রাণহানি ঘটে। তাই তিনি তাঁর পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে ফিরে আসেন এবং ইব্রাহীম খানের সাথে আবারো যোগ দেন। ইব্রাহীম আরো সৈন্য চেয়ে দুর্গে খবর পাঠান এবং সুসজ্জিত একদল অশ্বারোহী তাঁকে সহায়তা করার জন্য উপস্থিত হয়। এই সংবাদ শুনে দরিয়া খান কয়েক ক্রোশ পিছিয়ে যান এবং আব্দুল্লাহ খান জমিদারদের পরামর্শের ভিত্তিতে নদীর কয়েক ক্রোশ উজানে গিয়ে সেপথে পাড়ি দিয়ে দরিয়া খানের সাথে মিলিত হন। এই মিলিত বাহিনী এমনভাবে অবস্থান নেয় যে, তাদের একদিকে নদী এবং অপরদিকে একটি ঘন জঙ্গল। ইব্রাহীম খান নদী পাড়ি দিয়ে লড়াই করতে থাকেন। তাঁর অগ্রবর্তী বাহিনী পরাজিত হয়, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং অনেকে পালিয়ে যায়। ইব্রাহীম খানের অনুসারী দলটি ছোট্ট হওয়া সত্বেও ইব্রাহীম পলায়নে অস্বীকৃতি জানান। যদিও তাঁর কিছু লোক তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে টেনে তাঁকে যুদ্ধের বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, তিনি চিৎকার করে বলেন, "এই ধরনের পথ আমার জীবনের জন্য দরকার নেই, আমার কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়ার চেয়ে ভালো আর কী আছে ?" শত্রুরা যখন তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে শেষ করে দিচ্ছিল তখনও তিনি সেই কথাই বলে যাচ্ছিলেন।

তাঁর পতনের সংবাদ সৈন্যশিবিরকে হতাশ করে দেয় এবং অবরোধকারীরা দুর্গটির তলদেশ খনন করে সুরঙ্গ তৈরী করে সেখানে একটি বিস্ফোরণ ঘটায়। হামলাকারী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং স্থানটির দখল নিয়ে নেয়। সৈন্যদলের কেউ কেউ নদীতে ঝাঁপ দেয় এবং অন্য যারা ধরে নিয়েছিল যে, তাদের পরিবার-পরিজন শত্রুর হাতে বন্দী তারা বিজয়ী বাহিনীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। ইব্রাহীম খানের সন্তান ও সম্পত্তি ছিল ঢাকায়, তাই শাহজাদা (শাহজাহান)'র সৈন্যবাহিনী নদী পথে সেদিকে রওনা দেয়। ইব্রাহীমের ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ বেগ তাদের আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সামনে কেবলমাত্র আত্মসমর্পণের পথই খোলা ছিল এবং শাহজাদার একজন অনুগামীর কাছ থেকে তিনি প্রাণ রক্ষার্থে দয়া লাভ করেন। বিজয়ীরা সম্পত্তির (ইব্রাহীম খানের) দখল নেয়। নগদ প্রায় ৪০ লাখ রূপী ছাড়াও বিভিন্ন জিনিসপত্র ও হাতি তাদের হস্তগত হয়।

দরব খান অদ্যাবধি বন্দী ছিলেন, তবে তাঁকে এসময় মুক্তি দেয়া হয় এবং একটি শপথে আবদ্ধ হবার পর তাঁকে (শাহজাহান কর্তৃক) বাংলার প্রশাসক বানানো হয়, কিন্তু তাঁর স্ত্রী, এক কন্যা, এক পুত্র এবং শাহনওয়াজ খানের এক পুত্রকে আটক (তাঁরা যাতে বেঈমানী করতে না পারে তার জন্য জিম্মিসরূপ) করে রাখা হয়। রাণা করণের পুত্র রাজা ভীম – যিনি শাহজাদা শাহজাহানকে তাঁর কোন সমস্যা-সংকটকালেও ত্যাগ করেননি – তাঁকে পাটনার দিকে অগ্রবর্তী বাহিনীর প্রধান করে পাঠানো হয়। পাটনা প্রদেশ ছিল শাহজাদা পারভেজের জায়গীরের অধীন এবং এটাকে শাহজাদার দেওয়ান মুখলিস খান, ফৌজদার ইফতিখার খান ও শের খান আফগানের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজা ভীমের আগমনের আগেই তাঁরা ভীত হয়ে পড়েন। কোথাও থেকে কোন ধরনের সহায়তা পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে তাঁরা এমনকি পাটনা দুর্গেও শৃঙ্খলার কোন ব্যবস্থাই করেননি। তারা শাহজাহানের সৈন্যবাহিনীর এগিয়ে আসার জন্য কয়েকদিন মাত্র অপেক্ষা করেন এবং এই ধরনের একটি রাজ্য হাতছাড়া করে নিজেদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়ে সে এলাকা ত্যাগ করে ইলাহাবাসের দিকে চলে যান। অতঃপর রাজা ভীম পাটনা দুর্গে প্রবেশ করেন এবং কোন ধরনের প্রতিরোধ ছাড়াই বিহার প্রদেশের দখল নেন।

এর কয়েকদিন পর শাহজাদা শাহজাহান সেখানে আগমন করেন এবং প্রদেশের জায়গীরদাররা তাঁর সামনে হাজির হয়ে তাঁর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করেন। সৈয়দ মোবারক রোহতাস দুর্গ শাহজাদার জন্য জয় করে নেন। উজ্জয়নের জমিদাররাও আসেন এবং তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। শাহজাহান নিজে আরো অগ্রসর হবার আগে আব্দুল্লাহ খানকে একটি সৈন্যদলসহ এলাহাবাদের দিকে এবং দরিয়া খান আফগানকে অপর একটি বাহিনীসহ অযোধ্যার দিকে পাঠিয়ে দেন। কয়েকদিন পর বৈরাম বেগকে বিহারের দায়িত্বে

রেখে শাহজাদা রওনা হন। আব্দুল্লাহ খান জৌসা নদীর ক্ষীণধারা (যেখান দিয়ে নদী পার হওয়া সহজ) পার হবার আগেই জৌনপুর সরকারের প্রধান আজম খান মীর্জা কোকার পুত্র জাহাঙ্গীর কুলি খান স্থানটি ত্যাগ করে এলাহাবাদে মীর্জা রুস্তমের কাছে চলে যান। আব্দুল্লাহ প্রচণ্ডবেগে তার পিছু ধাওয়া করেন এবং এলাহাবাদের বিপরীত দিকে গঙ্গা নদীর পাড়ে অবস্থিত ঝাঁসি শহর পর্যন্ত চলে আসেন।[৩] শাহজাহান তখন জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হন। বাংলা থেকে নওয়ারা (যুদ্ধ নৌযান) আনা হয়েছিল। আব্দুল্লাহ খান সেগুলো থেকে গোলা-গুলি বর্ষণের মাধ্যমে নদীতে একটি নিরাপদ চলাচলের পথ উন্মুক্ত করার কাজে শুরু করে দেন এবং এলাহাবাদে তাঁর নিজের শিবির স্থাপন করেন।

দক্ষিণ

আমরা এখন অবশ্যই দক্ষিণ (দাক্ষিণাত্য)'র বিষয়ে ফিরে যাব। আম্বর হাবশী তাঁর দূত আলী শেরকে মহাব্বত খানের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাঁর আনুগত্য ও নিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করার জন্য – এই আশায় যে, দক্ষিণের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁকে (আম্বরকে) দেয়া হবে। তিনি আদিল খানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তিনি আশা করছিলেন রাজকীয় সহায়তা লাভ করবেন এবং এরপর শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করার আনন্দ উপভোগ করবেন। অপরদিকে আদিলখানও একইভাবে আশায় ছিলেন তিনি এই প্রদেশের দায়িত্ব পাবেন এবং এরপর আম্বরের হামলা প্রতিরোধ করবেন। শেষে আদিল খানই জয়ী হন। আম্বরের প্রস্তাব মহাব্বত খান প্রত্যাখ্যান করেন এবং আদিল খানের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেন। আম্বর রাস্তার উপর অবস্থান করছিলেন এবং আদিল খানের দূত মোল্লা মোহাম্মদ তাঁর কাছে অত্যন্ত ভীত-শংকিত অবস্থায় উপস্থিত ছিলেন। তাই মহাব্বত খান রাজকীয় বাহিনীর একটি দলকে বালাঘাট পাঠিয়ে তাঁকে প্রহরা দিয়ে বুরহানপুর নিয়ে আসেন। আম্বর এখবর পেয়ে ফিরে আসেন এবং বিরক্ত ও হতাশ হন। তিনি নিযামুল মুলকের সাথে গোলকুণ্ডার সীমান্তের উপর দিয়ে খিরকি থেকে কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে এবং তাঁর অধীনস্তদেরকে দৌলতাবাদের দুর্গে পাঠিয়ে দেন এবং খিরকি খালি করে দিয়ে চলে যান। তিনি প্রকাশ্যে বলে যান যে, তিনি রাজকীয় দায়িত্বের প্রতি আনুগত্য সহকারে জার-ই মুকাররারি (নির্ধারিত পাওনা বা কিছু কর) আদায় করার জন্য কুতুব উল মুলকের সীমান্তের দিকে যাচ্ছেন।

মোল্লা মোহাম্মদ লারি বুরহানপুরের কাছাকাছি পৌছলে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য মহাব্বত খান শাহপুর পর্যন্ত এগিয়ে যান এবং প্রচুর শিষ্টাচারের সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এরপর তাঁরা শাহজাদা পারভেজের সাথে সাক্ষাতের জন্য সেদিকে যাত্রা করেন। মহাব্বত খান বুরহানপুরের দায়িত্ব সরবুলন্দ রাইয়ের হাতে

দিয়ে যান এবং তাঁকে সহায়তা করার জন্য যদু রাই ও উ'দা রাম রাইকে রেখে যান। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে (তাঁরা যাতে বেঈমানী করতে না পারে তার জন্য জিম্মিসরূপ) যদু রাইয়ের পুত্র ও উ'দা রামের ভাইকে সাথে নিয়ে যান। মোল্লা মোহাম্মদ লারি ও শাহজাদা পারভেজের সাক্ষাতের সময় স্থির হয় যে, তিনি (লারি) তাঁর পাঁচ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে সরবুলন্দ রাইকে সহায়তা করতে বুরহানপুর চলে যাবেন এবং তাঁর পুত্র আমিন উদ্দিন অন্য পাঁচ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে শাহজাদার সাথে থাকবেন।



শাহজাদা পারভেজকে স্বাগত জানাচ্ছেন

দক্ষিণের সেনাবাহিনীর বক্‌শী ফাজিল খানের কাছ থেকে খবর নিয়ে লোক এসে (সম্রাটকে) জানায় যে, মোল্লা মোহাম্মদ লারি বুরহানপুরে গেছেন এবং রাজকীয় সেনাপতিরা এতে অনুভব করছেন যে, দক্ষিণ এখন নিরাপদ। শাহজাদা পারভেজ এবং মহাব্বত খান এরপর বিহার ও বাংলার দিকে রওনা দেন। শাহজাহানের খেদমত করতে গিয়ে খান-খানান (বৈরাম খানের পুত্র আব্দুর রহীম) যে বিদ্রোহ দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্র দারাবের যে কাণ্ড, তা বিবেচনা করে সেনাপতিরা সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁকে গ্রেপ্তার করে রাখা উচিত। শাহজাদা পারভেজের তাঁবুর কাছেই তাঁর তাঁবু স্থাপনের কথা ছিল – তাঁর কন্যা জানা

বেগমের বিয়ে হয়েছিল শাহজাদা দানিয়েলের সাথে এবং শাহজাদা উক্ত খান-খানানের বিচক্ষণ ছাত্রও ছিলেন – তাঁদের সবাইকে বন্দী করে একই স্থানে খান-খানানের সাথে রাখার নির্দেশ জারি হয় এবং বলে দেয়া হয় যে, তাঁদের তাঁবুর বাইরে যেন সর্বক্ষণ বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রহরার ব্যবস্থা রাখা হয়।

শাহজাহানের পরাজয়

সম্রাট যখন কাশ্মীরের বীরনাগে অবস্থান করছিলেন, তখন মহাব্বত খানের কাছ থেকে খবর আসে যে, গঙ্গার সমস্ত পথ শাহজাহানের সেনাপতিরা কব্জা করেছে এবং তারা সমস্ত নৌকা আটক করছে। এর ফলে রাজকীয় বাহিনীর নদী পাড়ি দিতে কিছুদিন বিলম্ব হয়, তবে জমিদারদের সহায়তায় তারা ৩০টি নৌকা সংগ্রহ করে এবং নদীর ক্ষীণধারার ৪০ মাইল উজানে নদী পাড়ি দেয়। পরবর্তী খবর হল, শাহজাহানের খেদমতে নিয়োজিত জমিদারদের একটি দল কামান ও সরঞ্জামসহ সমস্ত নৌকা দখল করে নিয়েছে এবং বাংলার দিকে পালিয়েছে। শাহজাহান কামপতের জঙ্গলে নিজেকে সুরক্ষিত করেছিলেন এবং সেখানে গড়ে তোলা প্রতিরক্ষা বাঁধের উপর কামান ও বন্দুক মোতায়েন করেন। তবে রসদ সরবরাহ ছিল অপ্রতুল এবং দ্রুত সংকট দেখা দিতে থাকে।

শাহজাদা পারভেজের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে ডাকচৌকি থেকে একজন সংবাদবাহক এসে সম্রাটকে একটি ঘোষণা শোনায় যে, শাহজাহানের বিরুদ্ধে শাহজাদা একটি বিজয় অর্জন করেছেন। শাহজাহান পালিয়ে পাটনা ও বিহারের দিকে চলে গেছেন। ঘটনার পূর্ণবিবরণ হল নিরূপ : দুই সৈন্যবাহিনী একে অপরের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে পড়েছিল এবং বহুদিন ধরে তারা যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হচ্ছিল। রাজকীয় বাহিনীতে ছিল চল্লিশ হাজার লোক এবং শাহজাহানের বাহিনীতে পুরনো ও নতুন সৈন্য মিলিয়ে দশ হাজারের বেশী অশ্ব ছিল না। এছাড়াও শাহজাহানের বাহিনীর সবচেয়ে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যেকার কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যুদ্ধের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করছিলেন। রাণার পুত্র রাজা ভীম সবার মতামতের বিরুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধের জন্য উৎসুক ছিলেন। তিনি এদ্দূর পর্যন্ত বলেন যে, যদি তারা যুদ্ধে না যান তাহলে তাদেরকে অবশ্যই তাঁর সমর্থনের ভরসা ত্যাগ করতে হবে, এ ধরনের পথচলা (পৃষ্ঠপ্রদর্শন) ও গতিবিধি রাজপুতদের নিয়ম-নীতির বিরোধী। তাঁর কথায় কাজ হয় এবং সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ করা হয়। কামানগুলো সুরক্ষিত স্থান থেকে বের করে আনা হয় এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। রাজকীয় বাহিনী তাদেরকে তিন দিক থেকে তীর-ধনুকের মত ঘিরে ফেলে এবং শিলাবৃষ্টির মত তীর ও গোলা বর্ষিত হতে থাকে। রাজা ভীম শত্রু সংখ্যাকে উপেক্ষা করে তাঁর রাজপুতদেরকে নিয়ে সাহসের সাথে হামলা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহজাদা পারভেজ ও

মহাব্বত খানের সাথে থাকা একদল বাছাই করা সৈন্য এবং তারা তাঁকে তরবারী দিয়ে আঘাত করে ফেলে দেয়। এরপরও যতক্ষণ তাঁর শ্বাস ছিল ততক্ষণ তিনি প্রচণ্ডভাবে লড়াই করে যান। কামান ফেলে তাদের সৈন্যরা পালিয়ে যায় এবং কামানগুলো রাজকীয় বাহিনীর দখলে চলে আসে। একটি তীর শাহজাহানের ঘোড়াকে আঘাত করে। তাঁর নিকটে অবস্থানরত আব্দুল্লাহ তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে টেনে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে যান এবং নিজের ঘোড়া শাহজাদাকে দিয়ে দেন। শাহজাহান রোহতাস দুর্গে চলে যান এবং সেখান থেকে পালিয়ে যান।[৪]

দক্ষিণ

এ সময় দক্ষিণ (দাক্ষিণাত্য) থেকে খবর আসে। মালিক আম্বর দুই বছর ধরে বাকী পড়ে থাকা সৈন্যবাহিনীর বার্ষিক নির্ধারিত পাওনা আদায়ের জন্য কুতুব উল মুলকের সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই পাওনা আদায় করার পর একটি চুক্তি ও অঙ্গীকারনামার মাধ্যমে নিজেকে সেইদিক থেকে নিরাপদ করে বিদারের দিকে এগুতে থাকেন। সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত আদিল খানের বাহিনীকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পাওয়ায় তিনি তাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালান এবং বিদার নগরীটি লুন্ঠন করেন। সেখান থেকে তিনি বিজাপুরের দিকে যাত্রা করেন। আদিল খান তাঁর সর্বোত্তম সৈন্য ও সেনাকর্তাদেরকে মোল্লা মোহাম্মদ লারির সাথে বুরহানপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তিনি হামলাকারীকে প্রতিরোধে নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে না করায় বিজাপুরের দুর্গে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দেন এবং সেই স্থানটিকে নিরাপদ করার জন্য যা যা দরকার সবকিছু করার পর একজন বার্তাবাহকের মাধ্যমে মোহাম্মদ লারি ও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে বুরহানপুর থেকে ডেকে পাঠান। মহাব্বত খান ও শাহজাদা পারভেজ যখন এলাহাবাদের দিকে রওনা দেন, তখন সরবুলন্দ রাইকে বুরহানপুরের দায়িত্বে রেখে যান এবং তাঁকে মোল্লা মোহাম্মদ লারির সাথে ঐকমত্যের মাধ্যমে দক্ষিণের কাজকর্ম পরিচালনার নির্দেশ দিয়ে যান। মোল্লা সে সময় খুবই চাপের মুখে পড়েন এবং সৈন্যদের বেতন পরিশোধের জন্য ১২ লাখ রূপীর সমপরিমাণ ৩ লাখ হুন্‌স দেন। মোল্লাকে ডেকে পাঠানোর পত্রটি মহাব্বত খানের হাতে পৌঁছলে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা মেনে নেন এবং আদিল খানকে সহায়তার লক্ষ্যে মোল্লাকে ত্বরা করে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য দক্ষিণের কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দেন। সরবুলন্দ রাই মাত্র কিছু লোককে সাথে নিয়ে বুরহানপুরে অবস্থান করেন, তবে তিনি লস্কর খান এবং দক্ষিণের সব আমীরকে মালিক আম্বরের মোকাবেলায় মোহাম্মদ লারির সাথে পাঠিয়ে দেন। মালিক এখবর পেয়ে রাজকীয় কর্মকর্তাদের কাছে পত্র লিখে রাজ সিংহাসনের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, কোন ধরনের হস্তক্ষেপ ছাড়াই

তাঁদের মধ্যকার বিরাজমান পুরনো বিভেদ মিটিয়ে দেয়ার জন্য নিজাম উল মুল্ক ও আদিল খানকে অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এই বক্তব্যের প্রতি কোন ধরনের কর্ণপাত না করে আমীররা অবিচলভাবে চাপ অব্যাহত রাখেন। তিনি (মালিক) পূর্বের চেয়ে আরো কাতর হয়ে তাঁর আবেদন আবারো পেশ করেন কিন্তু তাঁরা (আমীররা) তাঁদের শক্তি প্রদর্শন করেন এবং মালিক বাধ্য হন বিজাপুর ত্যাগ করে নিজের ভূখণ্ডের দিকে চলে যেতে। রাজকীয় বাহিনী এগিয়ে আসতে থাকায় আম্বর পুনর্মিলনের এবং সময়ক্ষেপণের চেষ্টা চালান, যুদ্ধ এড়ানোর জন্য তিনি কোন চেষ্টাই বাদ রাখেননি। কিন্তু মোল্লা মোহাম্মদ লারি ও রাজকীয় আমীরগণ তাঁর পিছু পিছু এগুতে থাকেন এবং তাঁকে বিশ্রামের কোন সুযোগ দেননি। তিনি যতই নত ও নাছোরবান্দা হচ্ছিলেন, মোহাম্মদ লারি তাঁকে তার চেয়েও বেশী নত করাতে চাইছিলেন এবং কঠোরতর চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন।

তাঁকে একেবারে কোনঠাসা করে ফেলা হয় এবং কিছু সুস্পষ্ট পন্থা অবলম্বনে বাধ্য করা হয়। তাই একদিন, যখন রাজকীয় বাহিনী অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল এবং তারা এই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিল যে, তিনি (মালিক) যুদ্ধ করবেন না – তখন আহমদ নগরের পাঁচ ক্রোশ দূরে তাদের শিবিরের প্রান্তভাগে তিনি (মালিক) হঠাৎ আবির্ভূত হন। আদিল খানের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং ভাগ্যের লিখন অনুযায়ী এই বাহিনীর অধিনায়ক মোহাম্মদ লারি নিহত হন। তাঁর পতনে বিজাপুরের বাহিনী বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। একটিও আঘাত না হেনে যদু রাই এবং উ'দা রাম পালিয়ে যান। ইখলাস খান এবং আদিল খানের অন্য আরো পঁচিশ জন কর্মকর্তা – যাঁরা ছিলেন তাঁর ক্ষমতার মূল শক্তি – তাঁরা সবাই বন্দী হন। এঁদের মধ্যে ফরহাদ খান – যিনি মালিক আম্বরের মৃত্যু কামনা করতেন – তাঁকে মেরে ফেলা হয়, অন্যদেরকে আটক করে রাখা হয়। লস্কর খান এবং রাজকীয় বাহিনীর আরো কিছু প্রধানকেও বন্দী করা হয়েছিল। ব্যাপক উদ্যমের দ্বারা খঞ্জর খান পালিয়ে আহমদ নগর চলে যেতে সক্ষম হন, তিনি সেখানকার দুর্গটিতে অবরোধ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। জান সিপার খান তাঁর জায়গীর বীরএ চলে যান এবং দুর্গটিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে নেন। খুনোখুনির ময়দান থেকে যারা পালিয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যকার বাকী ব্যক্তিদের কেউ পালিয়ে আহমদ নগর এবং কেউ পালিয়ে বুরহানপুর চলে যান। আশাতীত সাফল্য লাভকারী মালিক আম্বর তাঁর বন্দীদেরকে দৌলতাবাদ দুর্গে পাঠিয়ে দেন এবং আহমদ নগর অবরোধ করার জন্য রওনা হন। তবে তিনি সাথে করে কামান আনলেও এবং কঠোর অবরোধ চালালেও কোন সাফল্য পাননি। তিনি অবরোধ ধরে রাখার জন্য বাহিনীর কিছু অংশকে সেখানে রেখে বিজাপুরের বিরুদ্ধে রওনা দেন। আদিল খান আবারো দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নেন এবং বালাঘাটের মধ্যে

রাজকীয় ভূখণ্ডের সীমান্ত পর্যন্ত তাঁর সমস্ত ভূখণ্ড মালিক আম্বর দখল করে নেন। তিনি একটি চমৎকার সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেন এবং নিজাম উল মুল্‌ক ও আদিল খানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধীয় শোলাপুর অবরোধ করেন। তিনি বুরহানপুরের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং দৌলতাবাদ থেকে কামান এনে ঝড়ের বেগে হামলা চালিয়ে শোলাপুর দখল করে নেন।

এইসব বিপর্যয়ের খবর সম্রাটকে ব্যাপকভাবে উদ্বিগ্ন করে তোলে। মহাব্বত খানের পরামর্শে তিনি মহাব্বতের পুত্র খানাজাদ খানকে কাবুল থেকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে সসৈন্যে তাঁর পিতার সাথে যোগদানের জন্য পাঠিয়ে দেন।[৫] মহাব্বত খানের কাছ থেকে এসময় একটি খবর আসে। তাতে সম্রাটকে খবর দেয়া হয় যে, শাহজাহান পাটনা ও বিহার ছেড়েছেন এবং বাংলায় চলে গেছেন। শাহজাদা পারভেজ তাঁর ভবিষ্যৎ গন্তব্য সম্পর্কে নির্দেশের জন্য রাজকীয় বাহিনীসহ বিহারে অপেক্ষা করছিলেন। শাহজাহান যেভাবে খান-খানানের পুত্র দরবকে প্রথমে একটি শপথে আবদ্ধ করে এবং তারপর তাঁর স্ত্রী, সন্তান ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে জিম্মি করে বাংলার প্রশাসক বানিয়েছিলেন তা ইতিমধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। পরাজয়ের পর শাহজাহান সেই স্ত্রীকে রোহতাস দুর্গে এনে রাখেন এবং দরবকে ব্যক্তিগতভাবে দুর্গে আসার জন্য লিখে নির্দেশ পাঠান। দরব অনুচিত ও অমূলকভাবে বিষয়টাকে অন্যভাবে দেখেন এবং লিখেন যে, তিনি আসতে অক্ষম, কারণ জমিদাররা সবাই একজোট হয়েছে এবং তাঁর সামনে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে রেখেছে। শাহজাহান যখন দেখলেন যে, তিনি দরবের আসার ব্যাপারে আর কোন আশা করতে পারেন না এবং তাঁর (শাহজাদার) হাতে যুদ্ধ করার মত যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য নেই, তখন দরবের সন্তানকে আব্দুল্লাহ খানের দায়িত্বে রেখে নিজে আকবর নগর চলে যান, সেখানে তিনি ফেলে যাওয়া সমস্ত গোলা-বারুদ ও তল্পি-তল্পা তুলে নেন এবং যে পথে তিনি এসেছিলেন সেই পথেই দক্ষিণে ফিরে যান। দরব খান তাঁর ঘৃণ্য আচরণের দ্বারা সবসময়ের জন্য মর্যাদা হারিয়েছিলেন, তাই তাঁর পুত্রকে হত্যার মাধ্যমে আব্দুল্লাহ খান নিজের মন থেকে তাঁকে মুছে দেন, যদিও শাহজাহান তাতে বাধা দেয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন।

শাহজাদা পারভেজ বিহারকে মহাব্বত খান ও তাঁর পুত্রের কাছে জায়গীর দিয়ে তাঁর প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। দরবকে আটক করে রাখা জমিদারদের কাছে তিনি পরোয়ানা পাঠিয়ে হুঁশিয়ার করে দেন, তাঁকে যেন ক্ষতি করা না হয়, বরং যেন সৈন্যবাহিনীর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি (রাজধানীতে) এসে পৌঁছেন এবং তাঁর আসার সংবাদ সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি (সম্রাট) মহাব্বত খানের কাছে হুকুম জারি করেন যে, এই ধরনের একজন অথর্ব ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রেখে কোন কাজ নেই, তাই তার শিরোচ্ছেদ করে মাথাটি দরবারে পাঠিয়ে

দেয়া হোক। অতঃপর মহাব্বত খান তার শিরোচ্ছেদ করেন এবং মাথাটি সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেন। দক্ষিণে নতুন করে সৈন্য সরবরাহ না পৌঁছা পর্যন্ত যুদ্ধের মত কোন অভিযান নিষেধ করে কঠোর নির্দেশ পাঠানো হয় এবং সৈন্যদেরকে সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে নিরাপদ করার আদেশ দেয়া হয়।

রাজ্য শাসনের বিশতম বৎসর

রাজত্বের বিশতম বৎসর শুরু হয় ১০ই জমাদিউস সানী, ১০৩৩ হিজরী (১০ই মার্চ ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দ) এবং সম্রাট এদিন কাশ্মীরের পথে বেরিয়ে পড়েন। একটা বিষয় যা বহুবার বর্ণনা করা হয়েছে এবং 'জাকিরা খোয়ারিজম শাহী'তে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, জাফরান খেলে হাসির উদ্রেক হয় এবং বেশী পরিমাণে খেলে (হাসির চোটে) মৃত্যু ঘটার আশংকাও রয়েছে। মহামান্য সম্রাট (কাশ্মীর পৌঁছার পর) স্থির করেন তিনি এর প্রভাব দেখার জন্য একটি মহড়া করবেন এবং সে উদ্দেশ্যে কারাগার থেকে একজন দোষীসাব্যস্ত অপরাধিকে আনতে বলা হয়। তাকে একসের জাফরানের চার ভাগের এক ভাগ – যা ৪০ মিসকালের সমান – তাঁর (সম্রাটের) সামনে খাওয়ানো হয়। এতে ঐ লোকের মধ্যে কোনকিছু (পরিবর্তন) ঘটলো না। পরদিন তিনি তাকে দ্বিগুণ পরিমাণ খেতে দেন। কিন্তু এটাও তার মুখে অট্টহাসিতো দূরে থাকুক মুচকি হাসিও আনতে পারলো না। তাহলে জাফরান খেলে কি করে একজন লোকের মৃত্যু ঘটতে পারে ?

দক্ষিণের বক্‌শী আসাদ খানের কাছ থেকে খবর আসে যে, শাহজাহান দেওয়ালগামএ এসে উপস্থিত হয়েছেন, মালিক আম্বরের সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইউসুফ হাবশী বুরহানপুরে হামলা চালিয়েছে, সরবুলন্দ রাই তাঁর সুরক্ষিত স্থানে আবদ্ধ রয়েছেন এবং অবরোধকারীরা কিছুই অর্জন করতে পারেনি। পরের খবরটি ছিল, শাহজাহান লালবাগে (বুরহানপুরের আগে) পৌঁছেছেন এবং সেই স্থানের উপর বহু দফা হামলা চালিয়েও কোন সাফল্য পাননি। তিনি এ সময় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং বালাঘাটের রোহানগড়ে চলে যেতে বাধ্য হন।[৬] মালিক আম্বরের বাহিনী যখন দেখলো যে তারা কিছুই অর্জন করতে পারছে না, তখন তারা অবরোধ তুলে নিয়ে তাদের কর্তার কাছে ফিরে যায়। এসময় শাহজাদা পারভেজের সাথে দেখা করতে আসেন শাহজাদা দানিয়েলের পুত্র হোশাং এবং আব্দুর রহীম খান-খানান। প্রথম জনকে অত্যন্ত উদারতার সাথে গ্রহণ করা হয়। খান-খানান তাঁর কাজের জন্য দুঃখ ও লজ্জা প্রকাশ করেন। শাহজাদা তাঁর সাথে পরামর্শ করেন এবং নির্দেশ দেন যাতে তাঁকে একটি উপযুক্ত অবস্থানে রাখা হয়।[৭]

শাহজাদা পারভেজের কাছ থেকে বিযুক্ত হয়ে মহাব্বত খানকে বাংলার দিকে এগিয়ে যাবার একটি আদেশনামা নিয়ে ফিদাই খানকে শাহজাদা পারভেজের

কাছে পাঠানো হয়। খান জাহান লোদি গুজরাট থেকে এসে শাহজাদার (পারভেজের) উকিল হিসাবে কাজ করার কথা ছিল। ফিদাই খান এ সময় লিখে জানিয়ে দেন যে, শাহজাদা একদিকে মহাব্বত খানকে ছাড়তে অথবা অন্যদিকে খান জাহানকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন। এতদসত্ত্বেও তিনি খান জাহানকে তাঁর পদে দ্রুত যোগ দিতে বলার জন্য বার্তাবাহক পাঠিয়েছেন। এদিকে শাহজাদার কাছে আরেকটি ফরমান (সম্রাটের কাছ থেকে) এসে পৌঁছে, তাতে তাঁকে অবাধ্য না হতে সতর্ক করে দেয়া হয়। আরো বলা হয়, মহাব্বত খান যদি বাংলায় যেতে না চান তাহলে তাকে যেন দরবারে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং শাহজাদা এসময় বুরহানপুরে তাঁর আমীরদের সাথে অবস্থান করবেন।

১০৩৫ হিজরীর ১৯ মহররম সম্রাট কাশ্মীর থেকে লাহোর ফিরতে শুরু করেন।

শাহজাদা দাওয়ার বক্‌শ সম্রাটকে একটি বাঘ উপহার দেন, একটি ছাগলের প্রতি বাঘটির অন্য ধরনের অনুভূতি ছিল এবং বাঘ ও ছাগলটি একই খাঁচায় বাস করতো। তারা অভিন্ন ধরনের প্রাণী জোড়ার মতই আচরণ করতো। ছাগলটিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখতে নির্দেশ দেয়া হয় এবং এটা করার ফলে বাঘটি বিষণ্ন ও অস্থির হয়ে পড়ে। এরপর হুবহু একই রং ও আকারের অন্য একটি ছাগল সেই খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়ার আদেশ দেয়া হয়। এতে বাঘটি প্রথমে ছাগলটিকে শুঁকে দেখে এবং এর অল্প সময় পর এটিকে কামড়ে ধরে পিঠ মটকে দেয়। এবার একটি ভেড়া খাঁচাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হলে বাঘটি সেটিকে সাথে সাথে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে এবং গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে। অতঃপর তাঁরা আগের সেই ছাগলটি ফিরিয়ে আনেন এবং বাঘটি পূর্ণ ভালোবাসা সহকারে ছাগলটিকে গ্রহণ করে। বাঘটি চিৎ হয়ে শুয়ে ছাগলটিকে তার বুকের উপর টেনে নিয়ে তার মুখ চাটতে থাকে। একটি প্রাণী তার সমকক্ষ (স্ত্রী তুল্য) আরেকটি প্রাণীকেও এভাবে চুম্বন করার দৃশ্য পোষমানানো বা বন্য প্রাণীদের মাঝে কেউ কখনো দেখেনি।

বাংলা থেকে লব্ধ হাতিগুলো মহাব্বত খান তখনো দরবারে পাঠাননি এবং তাঁর ও তাঁর জায়গীর থেকে সাম্রাজ্য (রাষ্ট্র) প্রচুর অর্থ পাওনা ছিল। আরব দস্ত-ঘাইব হিসাবে পরিচিত পদের একজন ব্যক্তিকে সেই হাতিগুলো সংগ্রহ করে দরবারে প্রেরণের জন্য এবং মহাব্বত খানের সাথে পাওনার হিসাবপত্র সমাধা করার জন্য পাঠানো হয়। সবকিছু সন্তোষজনক হলে তাঁকে (মহাব্বত খানকে) দরবারে ফিরিয়ে নিতে বলে দেয়া হয়।

খবর আসে যে, গুজরাট থেকে খান জাহান এসে শাহজাদা পারভেজের সাথে যোগ দিয়েছেন। একই সময়ে খান জাহানের কাছ থেকে সম্রাটের কাছে একটি

পত্র আসে, তাতে তিনি বর্ণনা করেন যে, শাহজাহানকে আব্দুল্লাহ খান ত্যাগ করেছেন এবং তাঁর (খান জাহান) মাধ্যমে অনুতাপ ও নতিস্বীকার এর মাধ্যমে ক্ষমাপ্রার্থনা করছেন। খান জাহান তাঁর মধ্যস্থতায় সেই চিঠি যথাস্থানে (সম্রাটের কাছে) পাঠিয়ে দেন এবং ক্ষমা মঞ্জুর হয়।

৮ই জমাদিউস সানি সম্রাট কাবুলের দিকে যাত্রা শুরু করেন।

রাজত্বের একুশ বৎসর

১০৩৫ হিজরীর ১০ই জমাদিউস সানি সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের একুশতম বৎসর শুরু হয়। কর্তব্যপরায়ণ শাহজাহানের একটি পত্রের জবাব এসময় পাঠানো হয় এবং সাথে এক লাখ রুপী মূল্যের একপ্রস্ত হীরক সজ্জিত অলংকারসহ মূল্যবান উপহার সামগ্রী দেয়া হয়।

মহাব্বত খানের বিদ্রোহ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলায় অবস্থানরত মহাব্বত খানের কাছ থেকে হাতি নিয়ে যাবার এবং তাঁকে দরবারে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য আরব দস্ত-ঘাইবকে পাঠানো হয়েছিল। মহাব্বত খান প্রথমে হাতিগুলো পাঠিয়ে দেন এবং নিজে রাজকীয় শিবিরের (সম্রাট তখন লাহোরের পথে) সামনে এসে উপস্থিত হন। আসফ খানের[৮] প্ররোচনায় তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। আসফ খান চাইছিলেন তাঁকে অপদস্থ করতে এবং সম্মান, সম্পত্তি ও প্রাণ থেকে বঞ্চিত করতে। তবে মহাব্বত খান বুদ্ধিমত্তার সাথে আসফ খানের মতলব বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই তিনি আসার সময় সাথে করে চার হাজার বা পাঁচ হাজার সাহসী রাজপুত নিয়ে এসেছিলেন, যে রাজপুতরা অভিন্ন উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ ছিল। মহাব্বত খান সাথে করে ঐসব রাজপুতদের অনেকের স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদেরকেও নিয়ে এসেছিলেন, যাতে তাদেরকে চরমপন্থার দিকে ঠেলে দেয়া হলে তারা নিজেদের এবং তাদের পরিবারের জীবন ও সম্মান বাঁচানোর জন্য শেষপর্যন্ত লড়াই করে যায়। মহাব্বত খান যে কায়দায় এসেছিলেন তার উপর যদিও কঠোর নজরদারি চালানো হচ্ছিল তথাপি নবাব আসফ খান ব্যাপরটাকে নিয়ে ঔদাসীন্য ও অবহেলা করেন। তাঁর (মহাব্বত খানের) আসার খবরটা যখন সম্রাটকে জানানো হল, তখন না ডাকা পর্যন্ত তাঁকে দরবারে পাঠানোর ব্যাপারে নিষেধ করে একটি বার্তা পাঠানো হয়েছিল। তবে মহাব্বত খান যেসব হাতি সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

রাজকীয় অনুমতি ছাড়াই মহাব্বত খান তাঁর কন্যার বাগ্‌দান খাজা ওমর নক্‌শবন্দীর পুত্রের সাথে সম্পাদন করেছিলেন। সম্রাট এ ব্যাপারে আপত্তি জানান। তিনি সেই যুবকটিকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠান এবং তাকে ধরে এনে খুবই অপদস্থ এবং অত্যন্ত কর্কশ ব্যবহার করা হয়। তাঁকে গলার সাথে

দু'হাত বেঁধে এবং মাথা ন্যাড়া করে কারাগারে পাঠিয়ে দিতে সম্রাট নির্দেশ দেন।[৯] মহাব্বত খান সেই যুবককে যা যা দিয়েছেন তা সবই আটক করে রাজকোষে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য ফিদাই খানকে নির্দেশ দেয়া হয়।

সম্রাটের অপেক্ষার স্থান ছিল বিহাত নদীর তীরে। ঐ ধরনের একজন সাহসী ও নির্ভীক শত্রুর উপস্থিতি সত্ত্বেও আসফ খান তাঁর কর্তা (সম্রাট)'র নিরাপত্তার ব্যাপারে অমনোযোগী ছিলেন, তিনি সম্রাটকে নদীর পাড়ে রেখে নিজে ছেলে-মেয়ে, নারী, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে সেতু পার হয়ে ওপাড়ে চলে যান। তিনি মালপত্র, রাজকোষ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদীও পাঠিয়ে দেন।

মহাব্বত খান বুঝতে পারেন যে, তাঁর জীবন ও সম্মান বিপন্ন এবং সম্রাটের নিকটজনদের মাঝে তাঁর একজনও বন্ধু নেই, তাই তাঁর কোন ক্ষমতাও নেই। যে চার বা পাঁচ হাজার রাজপুত তাঁর কাছে বিশ্বস্ত থাকার শপথ নিয়েছিল তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি সেতুর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সেতু দখলে রাখা এবং কাউকে এটা পার হতে দেয়ার চেয়ে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে তিনি দুই হাজার অশ্বারোহী সেখানে রেখে যান। মহাব্বত খান তখন সম্রাটের তাঁবুর দিকে এগুতে থাকেন। এই 'ইকবালনামা'র লেখক সে সময় বক্শী এবং মীর তুজাকএর দায়িত্বে ছিলেন, তথাপি তিনি নদীর ওপারে যাননি, বরং এপাড়ে (সম্রাটের সাথে) অপেক্ষায় থেকে রাত্রি কাটিয়ে দেন। ফজরের নামাজ আদায় এবং সাথীদেরকে শুভসকাল বলার পর তিনি পরিদর্শনে বের হন। শোর উঠে যে, মহাব্বত খান আসছেন এবং আমার (লেখক) মনে হল যে, তিনি সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত (সম্রাটের) তাঁবুর দ্বারের দিকে গেছেন। তখন বলা হল যে, তিনি ব্যক্তিগত তাঁবু থেকে বেরিয়ে সম্রাটকে তাঁর অনুভুতি ব্যক্ত করার জন্য প্রশাসনিক তাঁবুর দিকে চলেছেন। আমার উপ-কক্ষের দ্বারে পৌঁছে তিনি সম্রাটের অবস্থানের ব্যাপার-স্যাপারে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। তাঁর আওয়াজ যখন আমার কানে গেল, আমি তরবারী নিয়ে তাঁবুর বাইরে আসি। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে নাম ধরে সম্বোধন করেন এবং মহামান্য সম্রাটের ব্যাপারে জানতে চান। আমি দেখতে পেলাম তাঁর সাথে বর্শা ও ঢাল নিয়ে এক শ'র মত পদাতিক রাজপুত রয়েছে এবং তিনি তাদের মাঝে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে অবস্থান করছেন। তবে ধুলা উড়তে থাকায় কারো চেহারা আমি ভালো করে দেখতে পারিনি। তিনি প্রধান দ্বার দিয়ে ঢুকে পড়েন এবং আমি একটি পার্শ্বদ্বার দিয়ে প্রশাসনিক কক্ষে (তাঁবুতে) প্রবেশ করি। আমি প্রশাসনিক কক্ষের ভিতর কয়েকজন ব্যক্তিকে প্রহরারত এবং গোসলখানার সামনে তিন-চারজন খোজাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মহাব্বত খান ঘোড় সওয়ার অবস্থায় প্রশাসনিক কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হন এবং ঘোড়ার পিঠ থেকে নামেন। তিনি যখন গোসলখানার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তাঁর সাথে থাকা রাজপুতের সংখ্যা দুই শ'র মত। আমি তখন এগিয়ে গেলাম এবং

স্বাভাবিক ক্ষুব্ধস্বরে বললাম, "এই ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য সকল নিয়ম-নীতির লংঘন, আপনি একটুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি ভিতরে গিয়ে খবর দিচ্ছি।" তিনি জবাব দেয়ার দরকার মনে করলেন না। তিনি যখন গোসলখানার দ্বারে উপস্থিত হন, তখন কক্ষের সামনে নিরাপত্তার জন্য দ্বাররক্ষক কর্তৃক রাখা একটি তক্তা তাঁর সাথে থাকা এক ব্যক্তি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে এবং টুকরোগুলোকে প্রশাসনিক কক্ষের মাঝখানের দিকে ছুঁড়ে মারে। মহামান্য সম্রাটের সাথে থাকা ভৃত্যরা এই দুঃসাহসী কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্রাটকে অবহিত করেন। সম্রাট তখন (গোসলখানা থেকে) বেরিয়ে আসেন এবং স্থান ত্যাগ করার লক্ষ্যে তাঁর জন্য অপেক্ষমান একটি পাল্কীতে উঠে বসেন। মহাব্বত খান আদবের সাথে পাল্কীর দ্বারের দিকে এগিয়ে যান এবং বলেন, "আমি নিজের সাথে নিজে কথা বলে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আসফ খানের বিদ্বেষ ও নির্দয় ঘৃণা থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব এবং আমাকে লজ্জা ও অসম্মানজনকভাবে মেরে ফেলা হবে। তাই আমি সাহস ও অতিবিশ্বাস নিয়ে নিজেকে মহামান্য সম্রাটের আশ্রয়ের সামনে ছুঁড়ে দিলাম। আমি যদি মৃত্যু বা শাস্তির উপযুক্ত হই তাহলে নির্দেশ দিন যেন তা আমি আপনার সামনে ভোগ করি।"

সশস্ত্র রাজপুতরা ইত্যবসরে দলে দলে ঢুকে পড়ে এবং রাজকীয় আবাস (তাঁবু) ঘিরে ফেলে। মহামান্য সম্রাটের সাথে তখন আরব দস্ত-ঘাইব এবং অন্য কয়েকজন কর্মচারী ছাড়া আর কেউ ছিল না। সেই বেঈমান কুকুরটার অমন মারমুখো প্রবেশ মহামান্য সম্রাটকে সতর্ক এবং ক্ষুব্ধ করে তোলে। তাই তিনি দুনিয়াকে এই নোংরা কুকুরের দুষিত উপস্থিতি থেকে পরিষ্কার করার জন্য তাঁর তরবারীতে দুইবার হাত রাখেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই মনসুর বদখ্শী বলেন, "এটা ধৈর্য ধারণ করার সময়, এই বেঈমান ধূর্ত কুকুরটার বিচার ন্যায়বিচারক আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন। প্রতিশোধ গ্রহণের দিন সামনে আসবে।" তাঁর কথাগুলো দূরদর্শী বলে মনে হওয়ায় মহামান্য সম্রাট সংযত হন। অল্প সময়ের মধ্যে রাজপুতেরা রাজকীয় তাঁবুর ভিতর-বাইর দখল করে নেয়, যার দরুন ভৃত্যরা ছাড়া আর কেউই মহামান্য সম্রাটের কাছে উপস্থিত হতে পারেনি। দুরাত্মাটা তখন বলে যে, "এখন এটা অশ্বারোহণে ভ্রমণ ও শিকারের সময়, তাই আপনি সে ধরনের একটি ফরমান জারি করে জানিয়ে দিন যে, আপনি শিকারে যাচ্ছেন, যাতে আপনাকে সাথে নিয়ে আমি এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারি, যাতে সবাই এটা এভাবে বুঝে নেয় যে, আমার এ দুঃসাহসী কাজটা মহামান্য সম্রাটের আদেশেই হচ্ছে।"[১০] মহাব্বত খান এ সময় তাঁর ঘোড়াটি এগিয়ে দেন এবং সম্রাটকে সেটিতে আরোহণ করার আহবান জানান কিন্তু রাজকীয় মর্যাদা সম্রাটকে সেই ঘোড়াতে চড়ার অনুমতি দেয় না, তাই তিনি তাঁর নিজের ঘোড়াটিকে আনার এবং ঘোড়ায় চড়ার সাজ-পোশাকগুলো তাঁর ব্যক্তিগত কক্ষে নিয়ে যাবার নির্দেশ

দেন, যাতে তিনি তা পরিধান করতে পারেন। কিন্তু ধূর্ত দুরাত্মাটা সম্রাটকে ভিতরে যেতে বাধা দেন।

ঘোড়া আনা পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করেন। মহামান্য সম্রাট সেটিতে চড়ে তাঁবু থেকে দুই ধনুকের দূরত্ব পর্যন্ত যান। একটি হাতি সামনে আনা হয় এবং মহাব্বত খান বলেন, বাইরে জনতার ভীড় এবং প্রচণ্ড কোলাহল। তাই মহামান্য সম্রাট যদি হাতির পিঠে ওঠেন এবং শিকারের স্থানের দিকে এগিয়ে যান তাহলে ভালো হয়। সম্রাট কোন ধরনের মন্তব্য এবং কোন বিরোধিতা না করে সেই জন্তুটায় গিয়ে ওঠেন। রাজপুতদের মধ্যকার সবচেয়ে বিশ্বস্তদের একজন হাওদার সামনে এবং দু'জন পেছনে বসে। সে সময় মোবারক খান সামনে এগিয়ে আসেন এবং মহাব্বত খানকে শান্ত করার জন্য হাওদার ভিতর সম্রাটের সাথে আসন গ্রহণ করেন। এই সময় তাড়াহুড়ার মধ্যে দুর্ঘটনাক্রমে মোবারক খান কপালে জখম হলে সেখান থেকে প্রচুর রক্ত ঝরতে থাকে এবং রক্তে তাঁর বক্ষদেশ ভিজে যায়। মহামান্য সম্রাটের একজন ব্যক্তিগত কর্মচারী – যিনি মদ পরিবেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন (পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না) – তিনি রাজকীয় মদ পেয়ালা হাতে আসছিলেন, তিনি এই সময় হাতির কাছে এসে দাঁড়ান। রাজপুতরা বর্শা ও হাত দিয়ে তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা চালায়, কিন্তু সেই লোকটি (কিছু না বুঝেই) দ্রুততার সাথে হাওদায় উঠে পড়ে। হাওদার বাইরে তিনজন বসার মত কোন স্থান না থাকায় সে নিজেকে হাওদার মাঝখানে ঠেলে দেয়। অর্ধক্রোশ যাবার পর হাতির আস্তাবলের প্রধান গজপত খান সম্রাটের নিজের হাতিটি নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি হাতির পিঠের সামনে এবং তাঁর পুত্র পেছনে বসা ছিলেন (এরাও পরিস্থিতি বুঝতে পারেননি)। এটা দৃশ্যতঃ মহাব্বত খানের সন্দেহের উদ্রেক করে এবং এই দুই নিরীহ লোককে হত্যা করার জন্য রাজপুতদেরকে ইঙ্গিত দেন।

যেন শিকারে যাচ্ছেন– এমন ধরনের পোশাক পরিহিত মহাব্বত খান এভাবে তাঁর আবাসস্থলের দিকে চলতে থাকেন। মহামান্য সম্রাট সেই আবাসের ভিতর যান এবং কিছু সময় সেখানে অবস্থান করেন। মহাব্বত খান তাঁর দুরাত্মা পুত্রদেরকে সম্রাটের চারপাশে দাঁড় করিয়ে দেন। নূরজাহান বেগমের কথা এতক্ষণ তাঁর মাথায়ই আসেনি। হঠাৎ মনে হওয়ায় তিনি নূরজাহানকেও বন্দী করে সেই দিক থেকেও নিজেকে নিরাপদ করার জন্য সম্রাটকে তাঁর রাজকীয় আবাসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন বলে স্থির করেন। এই মনোভাব থেকে তিনি সম্রাটকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। তবে ওদিকে যা ঘটলো তা হল, নূরজাহান ভেবেছিলেন মহামান্য সম্রাট শিকারে গিয়েছেন তাই এই সুযোগে তিনি খোজা জওহির খানের সাথে নদী পাড়ি দিয়ে তাঁর ভাই আসফ খানের সাথে দেখা করতে যান, তাই তাঁকে সম্রাটের আবাসে পাওয়া গেল না। নূরজাহানের চলে যাবার

ব্যাপারটা যখন মহাব্বত খান দেখতে পেলেন তখন নূরজাহানকেও জিম্মি (সম্রাটের মত) না করে যে মারাত্মক ভুল তিনি করেছেন তার জন্য প্রচণ্ড আফশোস করতে থাকেন। এ সময় শাহরিয়ার (শাহজাদা)এর কথা তাঁর মাথায় আসে এবং দেখেন যে, তাঁকে সম্রাটের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে দেয়াটা আরেক বিরাট ভুল হবে। তাই তিনি মহামান্য সম্রাটকে আবারো হাতির পিঠে তুলে নেন এবং তাঁকে শাহরিয়ারের বাড়ীর দিকে নিয়ে যান। প্রাণের আশংকা ও ভীতি এই বেঈমানটাকে এতটাই হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল যে, তাঁর কাজ ও কথা মোটেও সুবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল না। তিনি জানতেন না তিনি কি বলছেন বা কি করছেন, এমনকি কি করা উচিত। প্রতি মুহূর্তে তাঁর মনের মধ্যে কিছু পরিকল্পনা বা কিছু উদ্বেগ প্রবেশ করছিল এবং তিনি (এটা করলাম না কেন, ওটা করলাম না কেন – এসব ভেবে ভেবে) মনস্তাপে ভুগছিলেন। তাঁর কোন প্রস্তাবেই মহামান্য সম্রাট কোন ধরনের বিরোধিতা করেননি।



দুঃসাহসী বেঈমানটা যখন রাজকীয় তাঁবুতে প্রবেশ করেন তখন মরহুম সম্রাট আকবরের অন্যতম প্রধান আমীর সুজাত খানের নাতি জাহজু সেখানে ছিলেন এবং তিনি মহামান্য সম্রাটকে শাহরিয়ারের আবাসে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর সাথে সাথে সব জায়গায় যান। সেই বেঈমানটার অন্তরে কি সন্দেহ-সংশয় ঢুকেছিল তা

কেউ বলতে পারেনা, তবে মহামান্য সম্রাট যখন ঢুকে যান, মহব্বত খান তখন জাহজুকে আটক ও হত্যা করার জন্য তাঁর রাজপুতদেরকে নির্দেশ দেন এবং তারা দ্রুত তাঁকে শহীদ করে দেয়।

নূরজাহান নদী পার হয়ে তাঁর ভাইয়ের বাড়ীতে পৌঁছার পর সমস্ত প্রধান আমীরদেরকে ডেকে পাঠান এবং তাঁদের উদ্দেশে ভর্ৎসনামুলক বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "এটা ঘটেছে আপনাদের অবহেলা এবং নির্বোধের মত ব্যবস্থা রাখার দরুন। কারো কল্পনাতেও যা কখনো আসেনি তা-ই এখন ঘটে চলেছে এবং এখন আপনারা আপনাদের এধরনের কাজের জন্য লজ্জায় যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়ে আল্লাহ এবং জনগণের সামনে দাঁড়ান। এখন আপনারা এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য অবশ্যই উত্তম যা কিছু দরকার করুন এবং কি করা দরকার পরামর্শ দিন।" এক মনে ও এক বাক্যে তাঁরা সবাই পরামর্শ দেন যে, পরদিনই তাঁরা সৈন্য নামাবেন, বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত করার জন্য তাঁর (নূরজাহান) সাথে নদী পাড়ি দেবেন এবং মহামান্য সম্রাটকে উদ্ধার করবেন। এই বোকামিসুলভ সিদ্ধান্তের কথা সম্রাটের কানে পৌঁছে এবং তিনি তাদের এ কাজ বড় ধরনের ভুল হবে বলে মনে করেন। তিনি রাতের বেলা মুকাররিব খান এবং পর পর অন্য আরো অনেককে আসফ খান ও বড় বড় আমীরদের কাছে পাঠিয়ে যুদ্ধ করার জন্য নদী পাড়ি দেবার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দেন, কারণ তাতে বিরাট ভুল হয়ে যাবে, এতে ক্ষতি ও অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই মিলবে না। তিনি যেহেতু নদীর অপর পাড়ে (জিম্মি), তাই কিসের আশায় এবং কিসের আগ্রহে তাঁরা লড়াই করবেন। এই পরামর্শকে তাঁরা যাতে সত্য বলে (অর্থ্যাৎ তাঁর কাছ থেকে সত্যিই আগত বলে) বিশ্বাস করেন এবং যা বলা হয়েছে তা সেভাবে কার্যকর করেন তার জন্য প্রমাণ সরূপ তিনি (সম্রাট) মীর মনসুরের মাধ্যমে তাঁর খাস মোহর (যা সম্রাট আংটি হিসাবে আঙ্গুলে পরিধান করতেন) পাঠিয়ে দেন। তবে আসফ খান সন্দেহ করলেন, এসব মহাব্বত খান চাপাচাপি করে সম্রাটকে দিয়ে বলাচ্ছেন এবং করাচ্ছেন। তাই আসফ খান এসব কথায় কোন মনোযোগ দিলেন না, বরং তাঁরা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেটাই বাস্তবায়ন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন।

যা ঘটেছে সে সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে ফিদাই খান ঘোড়ায় চড়ে নদীর পাড়ে আসেন, তবে সেতুটি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এবং নদী পাড়ি দেবার কোন উপায় ছিল না। পার হবার জন্য কিছু না পেয়ে তিনি কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুসারী নিয়ে অপর পাড়স্থ রাজকীয় তাঁবুর বরাবর এসে উপস্থিত হন এবং সাঁতরে নদী পাড়ি দেবার চেষ্টা চালান। তাঁর ছয় জন অনুসারী পানিতে ডুবে যায় এবং অন্যরা পানি অত্যধিক ঠাণ্ডা হওয়ায় সামনে অগ্রসর হতে অপারগ হয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় ফিরে আসে। অন্য সাত জন ঘোড় সওয়ার নিয়ে খান অপর পাড়ে পৌঁছেন এবং এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা শুরু করেন। তাঁর চার জন সহগামী নিহত হন এবং যখন

দেখলেন যে, শত্রু খুবই শক্তিশালী বিধায় তিনি মহামান্য সম্রাটের কাছে পৌছতে পারবেন না এবং তাঁর প্রচেষ্টা অবশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, তখন তিনি লোহার দেয়ালে পাথরখণ্ড ছুঁড়ে ফেলার মত করে পশ্চাদপসারণ করে নিজেকে নদীর পানিতে ছুঁড়ে মারেন এবং যে তেজ ও উদ্যম নিয়ে গিয়েছিলেন সেই একই তেজ ও উদ্যম নিয়েই এপাড়ে ফিরে আসেন। সম্রাট সেই রাতটি শাহরিয়ারের আবাসেই কাটিয়ে দেন।

রবিবার, ইলাহী সনের ২০ই ফারওয়ার্দিন, ২১শে জমাদিউস সানি খাজা আবুল হাসান ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে আসফ খান সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁরা যুদ্ধ লড়বেন, নৌযানের অধিনায়ক গাজী কর্তৃক খুঁজে বের করা নদীটির একটি ক্ষীণধারার উপর দিয়ে নূরজাহান বেগমের উপস্থিতিতে নদী পাড়ি দিতে তাঁরা স্থিরসিদ্ধান্ত নেন। বাস্তবে দেখা গেল সেটি ছিল একটি জঘন্য ধরনের ক্ষীণধারা। সেখানে তিন-চারটি বড় বড় গর্ত ছিল যেখানটায় নদী ছিল গভীর – সেগুলো পার হতে হয়। সে অবস্থায় নদী পার হতে গিয়ে সমস্ত শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে এবং যে যেভাবে পারে সেভাবে নদী পার হয়ে যায়। হাতির পিঠে শিবিকায় বসা নূরজাহান বেগমকে নিয়ে আসফ খান, আবুল হাসান এবং ইরাদাত খান নদীর পাড়ে উঠেই শত্রুর একটি শক্তিশালী দলের সামনে গিয়ে পড়েন, শত্রুরা তাদের সামনের সারিতে হাতিতে সওয়ার সৈন্যদের দাঁড় করিয়ে কূলে অবস্থান করছিল। ফিদাই খান এক তীরের দূরত্বে কিছুটা ভাটিতে গিয়ে নদী পার হন। আসফ খানের পুত্র আবু তালিব এবং বেশ কিছু সংখ্যক লোক আরো কিছুটা ভাটিতে গিয়ে ক্ষীণধারা খুঁজে নিয়ে নদী পাড়ি দেন। পার হবার সময় এক পর্যায়ে ঘোড়াগুলোকে সাঁতরাতে হয়, এতে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামগুলো ভিজে যায় এবং ঘোড়ার সাজ-পোশাক বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। শত্রুরা যখন তাদের হাতিগুলো নিয়ে হামলা চালানোর জন্য পাড় বেয়ে নেমে আসে তখন কিছু সৈন্য (রাজকীয়) কূলে উঠতে সক্ষম হয় এবং কিছু তখনো পানিতে অবস্থান করছিল। এ অবস্থায় রাজকীয় অগ্রবর্তী সৈন্যরা ভয় পেয়ে যখন পিছিয়ে আসছিল আসফ খান ও খাজা আবুল হাসান তখনো নদীর মাঝখানে অবস্থান করছিলেন (এ অবস্থা দেখে আমি অসাড় হয়ে পড়েছিলাম, মনে হচ্ছিল যেন আমার মাথার উপর একটি মাইল-নির্দেশক পাথর[১১] ঘুরপাক খাচ্ছিল। কেউ কাউকে তোয়াক্কা করছিল না, কেউ কারো কথায় কানও দিচ্ছিল না, কেউই কোন ধরনের দৃঢ়প্রত্যয় দেখাতে সক্ষম হয়নি। যে ক্ষীণধারা দিয়ে নদী পার হওয়া সহজতর ছিল সেই স্থানটাকে নিরাপদ করে, এরপর অপর পাড়টাকে দখলে রাখার জন্য একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেয়ার দরকার ছিল, যাতে যারা আগেই সেই পাড়ে পৌছে যেত তাদেরকে সহায়তা করার জন্য কোন ধরনের বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই আমীরগণ এবং তাঁদের লোকজন পার হয়ে যেতে পারতো। এটা ছিল এমন এক সময়, যখন শৃঙ্খলা, দৃঢ়প্রত্যয় এবং

নিষ্ঠা প্রদর্শন দরকার ছিল। কিন্তু এই সময় যারা সামনে এগিয়ে গিয়েছিল তারা সবাই পিছিয়ে আসে এবং যারা এর পর পর গিয়েছিল তারাও একত্রে পিছিয়ে আসে। কর্মকর্তারা (সৈন্যদের প্রধানরা) আতংকে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, নিজেরা কোথায় যাচ্ছে তা যেমন বুঝতে পারছিল না, তেমনি তারা তাদের লোকজনকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাও জানতো না।

আমি এবং খাজা আবুল হাসান নদীটির একটি শাখা পাড়ি দিয়ে এর দ্বিতীয় পাড়ে দাঁড়িয়ে আমাদের গন্তব্যের দিকে তাকিয়ে কিভাবে ঐ পাড়ে গিয়ে যা করণীয় তা করবো দেখছিলাম। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যরা, অশ্ব, উট ও শকট (ঘোড়া, উট ও গরুতে টানা গাড়ী) গুলো তখনো নদীর মাঝখানে একে অপরের সাথে হুড়োহুড়ি করছিল এবং অপর পাড়ের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এই সময় নূরজাহানের একজন খোজা – যার নাম ছিল নাদিম – আমাদের কাছে আসে এবং বলে, "বেগম জানতে চেয়েছেন এটা কি বিলম্ব করার এবং ইতস্ততঃ করার সময় ? সাহসের সাথে সামনে অগ্রসর হোন, যাতে আপনাদেরকে এগিয়ে যেতে দেখে শত্রুরা পিছু হটে এবং পালিয়ে যায়।" আমি এবং খাজা জবাব দেয়ার জন্য অপেক্ষা না করেই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সাত বা আটশত রাজপুত বিপুল সংখ্যক যুদ্ধের হাতি সামনে দাঁড় করিয়ে নদীর অপর পাড় দখলে রেখে শক্ত ব্যূহ রচনা করে অবস্থান করছিল। ভেঙ্গে যাওয়া ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়া অবস্থায়ই আমাদের কিছু লোক, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য পাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। শত্রুরা তাদের হাতিগুলোকে সামনে ঠেলে দেয় এবং পেছন পেছন অশ্বারোহীরা এসে পানিতে নেমে পড়ে তাদের তরবারী উত্তোলন করে। আমাদের বহু সংখ্যক লোক নেতৃত্বের অভাবে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যায় এবং তাদের রক্তের দ্বারা শত্রুদের তরবারী নদীর পানিকে রঞ্জিত করে দেয়। বেগম নূরজাহানের সাথে তাঁর শিবিকায় শাহরিয়ারের কন্যাও অবস্থান করছিলেন। তাঁর আংকা বা সেবিকা ছিলেন শাহনওয়াজ খানের কন্যা। এই আংকার বাহুতে একটি তীর এসে লাগে এবং বেগম নিজে সেটি টেনে বের করে আনেন, এতে তাঁর পোশাক রক্তে ভরে যায়। বেগম যে হাতিটিতে চড়ছিলেন সেই হাতিটি শুণ্ডে তরবারীর আঘাতে জখম হয় এবং এসময় এটি পেছন দিকে ঘুরে গেলে পশ্চাতদেশে দুই-তিনবার বর্শা দ্বারাও আঘাত পায়। রাজপুতদেরকে নাঙ্গা তরবারী হাতে এটির সামনে ঠেলে দেয়া হয় এবং এঅবস্থায় হাতিটির মাহুত হাতিটিকে গভীর পানির দিকে নামিয়ে নেয়। অশ্বারোহীরা সাঁতরাচ্ছিল এবং এক পর্যায়ে তারা ডুবে যাবে মনে করে ভীত হয়ে পশ্চাদপসারণ করে। হাতিটি (বেগমকে বহনকারী) সাঁতরে পাড়ে (যে পাড় থেকে এসেছিল সে পাড়ে) উঠে যায় এবং বেগম রাজকীয় আবাসের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। খাজা আবুল হাসান এবং আমি একসাথে ছিলাম। তিনি আমাকে ত্যাগ করে দ্রুত বেগমের (আবাসের)

দিকে ছুটে যান এবং আমি আমার চল্লিশজন লোক নিয়ে নদীর ধারে রয়ে গেলাম। তারা (শত্রুরা) তীর বর্ষণ করে, তবে রাজপুতরা আমি যে পাড়ে অবস্থান করছিলাম সেদিকে পার হয়ে আসার কোন চেষ্টা করেনি। এসময় আসফ খানকে দেখা গেল, তাঁর সহগামীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল এবং তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি স্থান ত্যাগ করেন। আমি তাঁর অনুগামীদেরকে জড়ো করার চেষ্টা করেছি এবং চিৎকার করে ডাকাডাকি করেছি কিন্তু তাদেরকে খুঁজে পেলাম না, এমনকি তাদের কোন চিহ্নও দেখলাম না।

খাজা আবুল হাসান আমাকে রেখে দ্রুত গতিতে ছুটে গিয়েছিলেন এবং উত্তেজনা ও উদ্বেগের সাথে তিনি ঘোড়ায় সওয়ার অবস্থায় নদীতে নেমে পড়েন। পানি ছিল গভীর এবং স্রোত ছিল প্রবল। ঘোড়াটি সাঁতার কাটার সময় তিনি পড়ে যান কিন্তু তিনি দুইহাতের বজ্রমুষ্ঠিতে ঘোড়ার জিন ধরে ফেলেন। ঘোড়াটি বহুবার পানিতে ডুবে যায় এবং ভেসে ওঠে কিন্তু খাজা কখনোই জিন হাত থেকে ছাড়েননি। এক কাশ্মীরী মাঝি তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করে।

ফিদাই খান সম্রাটের ভৃত্যদের একটি দল এবং তাঁর সাথে বহুদিন ধরে যুক্ত কিছু লোকজন নিয়ে নদী পাড়ি দেন এবং যে বাহিনী তাঁর মোকাবেলা করতে এসেছে তাদের উপর হামলা চালান। তিনি শত্রুদেরকে পিছু হটিয়ে দেন এবং সম্রাটের অবস্থানস্থল শাহরিয়ারের বাড়ীতে পৌঁছে যান। বাড়ীটির অভ্যন্তরভাগ তখন অশ্বারোহী ও পদাতিক উভয় ধরনের লোকে পূর্ণ ছিল, তাই প্রবেশ পথে ফিদাই খান থামেন এবং বাড়ীটির অভ্যন্তর লক্ষ্য করে তীর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। কিছু সংখ্যক তীর মহামান্য সম্রাটের ব্যক্তিগত কক্ষের কাছের অঙ্গনে গিয়ে পড়ে। তখন মুখলিস খান সম্রাটের সুরক্ষায় নিজের শরীরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে যান। ফিদাই খান বেশ কিছু সময় ধরে অধ্যবসায়ের সাথে তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান, কিন্তু তাঁর বহু অনুগামী প্রাণ হারায়, অন্যরা মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং খানের নিজের ঘোড়াটিও চারটি আঘাত পায়। যখন তিনি দেখলেন যে, তিনি সফল হতে পারবেন না এবং সম্রাটের কাছে পৌঁছতে পারারও কোন সুযোগ নেই, তখন তিনি শিবিরের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে নদীর পাড়ে চলে আসেন। পরদিন তিনি নদী পাড়ি দেন এবং রোহতাসে অবস্থানরত তাঁর পুত্রদের কাছে চলে যান।

আসফ খান – যাঁর কারণে এতবড় দুর্যোগ নেমে এসেছিল এবং যাঁর নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারীতার জন্য ঘটনা এদ্দূর পর্যন্ত গড়ায় – তিনি যখন দেখলেন যে, তিনি কোনভাবেই মহাব্বত খানের সামনে দাঁড়াতে পারছেন না, তখন তিনি তাঁর পুত্র আবু তালিব এবং দুই-তিনশত অশ্ব ও ভৃত্য নিয়ে আটাক দুর্গে চলে যান। সেটা ছিল তাঁর জায়গীর। তিনি দুর্গে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। আটাকে হামলা চালানোর জন্য মহাব্বত খান তাঁর পুত্র বিহরোজ ও এক রাজপুতের

নেতৃত্বে তাঁর কিছু অনুগামী ও আশেপাশের জমিদারদের সাথে রাজকীয় আহাদী (রক্ষী)দের একটি বিরাট দলকে পাঠিয়ে দেন। তারা দুর্গটি দখল করে এবং আসফ খান ভাগ্যের কাছে হার মানেন। তিনি মহাব্বত খানকে সমুন্নত (ইজ্জত-সম্মান ও প্রাণ) রাখবেন বলে শপথ করেন। সম্রাট যখন আটাকে নদী পাড়ি দেন, তখন মহাব্বত খান দুর্গের ভিতর প্রবেশ করার রাজকীয় অনুমতি লাভ করেন এবং আসফ খান ও তাঁর পুত্র আবু তালিবকে বের করে নিয়ে আসেন। এরপর দুর্গটির দায়িত্ব তিনি তাঁর অনুগত ব্যক্তিদের হাতে দেন। আসফ খানের বহু অনুগামীকে হত্যা করা হয়। রাজকীয় শিবির (মহাব্বত খানের হাতে বন্দীরা) জালালাবাদে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয় এবং ২১শে শাবান কাবুলে পৌঁছে।[12] সম্রাট এখানে তাঁর পূর্বপুরুষদের সমাধিগুলো জেয়ারত করেন। রাজপুতদের একটি দল তাদের ঘোড়াগুলো চরানোর জন্য কাবুলের কাছে শিকারভূমিতে নিয়ে যায় এবং এখানে ঘোড়ার রক্ষকদের মধ্যে কোন কারণে বিবাদ বেঁধে গিয়ে আত্মকলহে একজন আহাদী নিহত হয়। আহাদীরা এর প্রতিকার চায়, তবে যে জবাব তাদেরকে দেয়া হয় তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে তারা রাজপুতদেরকে আক্রমণ করে এবং তাদের ছয়-সাতশত জনকে হত্যা করে।[13]

মালিক আম্বরের মৃত্যু

খবর আসে যে, ৩১শে উরদিবিহিশত (ইলাহীসন অনুযায়ী মাসের ফার্সী নাম) ৮০ বছর বয়সে হাবশী (ইথিওপিয়ান) আম্বর মৃত্যুবরণ করেছেন। এই আম্বর একজন দাস ছিলেন, তবে সক্ষম মানুষ ছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ, নেতৃত্বদান, সুষ্ঠু বিচার এবং প্রশাসন পরিচালনায় তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি লুণ্ঠনধর্মী যুদ্ধ ভালো বুঝতেন, এ ধরনের যুদ্ধকে দক্ষিণের ভাষায় বলে 'বর্গীগিরি'। তিনি ঐ দেশের অশান্তনীতিকে (লুণ্ঠননীতি) পরাভূত করেছিলেন, তিনি আমৃত্যু তাঁর উজ্জ্বল অবস্থান ধরে রেখেছিলেন এবং সম্মানের সাথে তাঁর জীবনধারা সম্পন্ন করেন। আর কোন হাবশীর এত বিখ্যাত পর্যায়ে পৌঁছার কথা ইতিহাসে উল্লেখ নেই।

সম্রাট যখন কাবুল ছিলেন তখন নূরজাহান বেগমকে সাথে নিয়ে[14] শাহ ইসমাঈলের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। এসময় সম্রাটের কাছে খবর আসে যে, নিজাম-উল-মুলকের সীমান্ত থেকে শাহজাহান সরে গিয়ে মালওয়ার মধ্যদিয়ে আজমীরের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। তবে তিনি সেখানে অবস্থান না করে জয়সলমীরের পথ ধরে থাট্টা চলে যান। এসব শুনে শাহরিয়ার এবং মহামান্য সম্রাট কাবুল থেকে হিন্দুস্তানের পথে যাত্রা শুরু করেন। এসময় খবর আসে যে, শাহজাদা পারভেজ গুরুতর অসুস্থ। তিনি প্রথমে শূল বেদনায়[15] আক্রান্ত হন, এরপর তিনি অচেতন হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসা গ্রহণের পর থেকে তিনি গভীর

ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁর মাথা ও কপালের পাঁচটি স্থানে লৌহশলাকা দ্বারা শেঁক দেন। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে তাঁর এই অসুখ হয়েছিল। তাঁর চাচা শাহ মুরাদ এবং শাহজাদা দানিয়েলও এই একই শারীরিক ব্যধিতে মারা গিয়েছিলেন।



শাহাজাদা দানিয়েল।

সম্রাটের পলায়ন

মহামান্য সম্রাট তাঁর ভালো সহজাত গুণাবলী ও ভদ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে মহাব্বত খানের সাথে মিটমাট করে মিলে যান এবং তাঁকে ব্যাপক আনুকূল্য ও দয়া দেখান, যাতে তাঁর দিক থেকে মহাব্বত খান নিজেকে নিরাপদ মনে করেন। নূরজাহান বেগম সম্রাটকে একান্তে যা যা বলেছিলেন সম্রাট সে সবই অকপটে মহাব্বত খানকে জানিয়ে দেন এবং তাঁকে সতর্ক থাকতে বলেন, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে বেগম সাহেবা একটি পরিকল্পনা আঁটছেন। তিনি (সম্রাট) তাঁকে আরো বলেন যে, আসফ খানের পুত্র শায়েস্তা খানের সাথে শাহনওয়াজ খানের যে কন্যার বিয়ে হয়েছিল সেই কন্যাটি হুমকি দিয়ে বলেছে যখনই সে সুযোগ পাবে তখনই সে তাঁকে (মহাব্বত খানকে) গুলি[১৬] করবে। এইভাবে তিনি মহাব্বত খানের অন্তরকে শান্ত করেন এবং মহাব্বত খান প্রথমদিকে যা ধারণা করেছিলেন সেসব সংশয়-সন্দেহ তিনি (সম্রাট) দূর করে দেন। মহাব্বত খানের নজরদারি কমে যায়, তাঁর সাথে আনা রাজপুত প্রহরী– যাদেরকে প্রাসাদ ঘিরে রাখার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল – তাদের প্রহরা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং নিয়ন্ত্রণের বাঁধন ঢিলেঢালা হয়ে যায়। এছাড়াও কাবুলে আহাদীদের সাথে লড়াইয়ে তিনি তাঁর বেশকিছু উত্তম লোকজন হারিয়েছেন।

নূরজাহান বেগম তাঁর (মহাব্বত খানের) বিরুদ্ধে একান্তে এবং প্রকাশ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি অর্থ ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক অনুসারী পরিচালনা করছিলেন ও তাদেরকে তাঁর সাথে রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর খোজা হুঁশিয়ার খান লাহোরে তাঁর (বেগমের) চিঠি পেয়ে সে অনুসারে দু'হাজার লোক জোগাড় করেন এবং তাঁর সাথে মিলিত হবার জন্য অগ্রসর হতে থাকেন। এছাড়াও রাজকীয় প্রহরীদের (escort) চারপাশে প্রচুর লোকজন জুটে গিয়েছিল। রোহতাস থেকে একবারে অতিক্রম্য (one march) দূরত্বে অবস্থানকালে মহামান্য সম্রাট তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীর শক্তি একবার পর্যালোচনা করে দেখে নেবার স্থির সিদ্ধান্ত নেন। পুরাতন ও নতুন সমস্ত সৈন্যকে রাজকীয় আবাস থেকে যদ্দূর যায় তদ্দূর পর্যন্ত দুই সারিতে দাঁড়ানোর জন্য তিনি আদেশ জারি করেন। এরপর তিনি তাঁর একজন কর্মচারী বুলন্দ খানকে মহাব্বত খানের কাছে গিয়ে বলতে বলেন যে, মহামান্য সম্রাট সেদিন বেগমের সৈন্য কোন পর্যায়ে রয়েছে তা পর্যালোচনা করছেন, তাই সেদিনের নিয়মিত কুচকাওয়াজ (মহাব্বত

খানের সৈন্যদের) বাতিল করাই তাঁর জন্য ভালো হবে, পাছে দুই পক্ষের মধ্যে কোন ধরনের কথা কাটাকাটির জেরে বিবাদ বেঁধে যেতে পারে। তিনি তাঁর ইচ্ছাকে আরো জোরদারভাবে বাস্তবায়নের জন্য বুলন্দ খানের পর খাজা আবুল হাসানকে পাঠান এবং মহাব্বত খানকে তাঁর লোকজন নিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে কোথাও বিশ্রামের স্থানে চলে যাবার আহবান জানান। খাজা যথার্থ কারণে মহাব্বত খানের উপর চটে ছিলেন। তথাপি তিনি সমস্ত ঔদ্ধত্ব ও ক্ষমতার অনুচিত প্রয়োগ বাদ দিয়ে দ্রুত তাঁর কাছে যান। মহামান্য সম্রাট দ্রুততার সাথে তাঁকে অনুসরণ করেন (পিছু পিছু বেরিয়ে পড়েন) এবং পথ অতিক্রমের পর প্রথম বিশ্রামের স্থানে না থেমে দ্বিতীয় বিশ্রামের স্থানে থামেন এবং নদী পাড়ি দিয়ে রোহতাসের দিকে চলতে থাকেন।[১৭] ঐপাড়ে গিয়ে সম্রাট দেখতে পান তাঁকে গ্রহণ করার জন্য সভাসদবর্গের একটি দল অপেক্ষমান আছেন।

সম্রাট এবার মহাব্বত খানের কাছে চারটি লিখিত আদেশ পাঠান। ১) শাহজাহান যেহেতু থাট্টার দিকে গেছেন, তাই তিনি (মহাব্বত খান) যেন সেদিকেই যান এবং সেখানে গিয়ে ব্যাপরটা (শাহজাহানের বিদ্রোহ) মীমাংসায় সহায়তা করেন। ২) আসফ খান এবং তাঁর পুত্র আবু তালিবকে যেন রাজদরবারে পাঠিয়ে দেয়া হয়।[১৮] ৩) মরহুম শাহজাদা দানিয়েলের পুত্র তাহমুরাস ও হোশাংকে যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই দুইজনের দায়িত্ব ইতিপূর্বে মহাব্বত খানের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল। ৪) মুখলিস খানের পুত্র লশকরীকেও যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়। লশকরী ছিলেন মহাব্বত খানের জামিন, যিনি তখনও দরবারে এসে হাজির হননি। তিনি (সম্রাট) হুঁশিয়ার করে দেন যে, যদি আসফ খানকে পাঠাতে মহাব্বত খান বিলম্ব করেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেয়া হবে।

দানিয়েলের দুই পুত্রকে আফজাল খান নিয়ে আসেন, তবে আসফ খানের ব্যাপারে তিনি মহাব্বত খানের কাছ থেকে একটি বার্তা আনেন। তাতে মহাব্বত খান বলেছেন, তিনি থাট্টা যাচ্ছেন, তবে তিনি নূরজাহানের দিক থেকে নিরাপদ নন। তিনি ভয় পাচ্ছেন, যদি তিনি আসফ খানকে চলে যেতে দেন, তাহলে এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠানো হবে। তাই তিনি (সম্রাট) লাহোর অতিক্রম করা পর্যন্ত সবধরনের আনুগত্য সহকারে আসফ খানকে আট্‌কে রাখবেন এবং এরপর তাঁকে ছেড়ে দেবেন। এই জবাব বেগম (নূরজাহান)কে সাংঘাতিকভাবে রাগিয়ে দেয়, তিনি আফজাল খানকে আবারো পাঠান, যাতে তিনি (আফজাল খান) যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তা মহাব্বত খানের সামনে তুলে ধরে বলে দেন যে, আসফ খানকে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কোন ধরনের বিলম্ব অবশ্যই হতে পারবে না এবং আরো কোন উস্কানী সৃষ্টি করার ব্যাপারে যেন তিনি (মহাব্বত খান) সাবধান হন। এই বার্তা শুনে মহাব্বত খান ভয় পেয়ে যান।

তিনি আসফ খানের কাছে লোক পাঠিয়ে ক্ষমা চান এবং একটি শপথ ও অঙ্গীকারে (মহাব্বত খানের উপর কোন প্রতিশোধ নেয়া হবে না মর্মে) তাঁকে আবদ্ধ করেন। এরপর তাঁর প্রতি যথেষ্ট যত্ন দেখিয়ে তাঁকে রাজদরবারে পাঠিয়ে দেন। তবে উপরে বর্ণিত কারণ দেখিয়ে তিনি আসফ খানের পুত্র আবু তালিবকে কয়েকদিনের জন্য আটক করে রাখেন। এরপর তিনি এমনভাবে এগুতে থাকেন যাতে মনে হয় যে, তিনি থাট্টার দিকে যাচ্ছেন।

রাজ সভাসদরা যখন লাহোরে পৌঁছেন, তখন আসফ খান পাঞ্জাবের সুবাহদারী পান। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবেও নিয়োগ করা হয় এবং রাজস্ব ও রাজনৈতিকসহ প্রশাসনের সকল ব্যাপারে তিনি স্থায়ীভাবে তত্ত্বাবধান করবেন বলে একটি আদেশ জারি করা হয়।

মহাব্বত খান থাট্টার দিকে বেশীদূর না এগিয়ে ফিরে দাঁড়ান এবং ভাগ্যের অন্বেষণে হিন্দুস্তানের দিকে চলে যান। খবর আসে যে, তাঁর কাছে বাংলা থেকে বাইশ লাখ রূপী আসছে এবং এই রূপী বহনকারী সামরিক বহর দিল্লীর কাছে এসে পৌঁছেছে। এই ধনসম্ভার আটক করার জন্য একটি দল (সম্রাটের পক্ষ হতে) পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং তারা শাহাবাদের কাছে এই বহরটির উপর চড়াও হয়। যে লোকেরা রূপীতে পূর্ণ সেই পশুটানা মালগাড়ীর দায়িত্বে ছিল তারা একটি সরাইতে আশ্রয় নিয়ে সেটিকে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং জীবন দিয়ে হলেও সেই ধনসম্ভার রক্ষা করার দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। জোর লড়াই চলার পর রাজকীয় সৈন্যরা সরাইটিতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ধনসম্ভারের সেই রক্ষকরা পালিয়ে যাবার পর সেসবের দখল নেয়।

দক্ষিণ থেকে আসা সংবাদ

শাহজাদা পারভেজ ১০৩৫ হিজরীর ৬ই সফর মৃত্যুবরণ করেন। এই সময় তাঁর বয়স হয়েছিল আটত্রিশ বছর।

দক্ষিণ (দাক্ষিণাত্য) থেকে খবর আসে যে, সে দেশে মালিক আম্বরের পর যার পদমর্যাদা ছিল সেই ইয়াকুব খান হাবশী – যিনি তাঁর জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন – এখন রাজকীয় সিংহাসনের সামনে নিজেকে সমর্পণ করার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[১৭] খান জাহান উষ্ণ ও আশ্বাসমুলক ভাষায় ইয়াকুবের কাছে পত্র লিখেন এবং আমীরদেরকে নির্দেশ দেন যাতে সমস্ত আতিথেয়তা ও সম্মান সহকারে তাঁকে গ্রহণ করে বুরহানপুর নিয়ে আসা হয়।

শাহজাহান

এটা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাহজাহান একটা ছোটখাটো অনুগতদল নিয়ে থাট্টার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পূর্ববতী বছরগুলোতে তিনি পারস্যের শাহ আব্বাসের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন এবং তাঁর এই বর্তমান সংকটকালে তিনি তাঁর (শাহ আব্বাস) কাছেই চলে যাবার মনোভাব পোষণ করেন। আশা করছিলেন, তাঁর অসুবিধা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনা পাবেন। থাট্টার কাছাকাছি হতেই সেই দেশটির প্রশাসক শরীফুল মুল্ক – যিনি শাহরিয়ারের একান্ত অনুগত সেবক ছিলেন – দেশটি থেকে সংগৃহীত তিন বা চারহাজার অশ্ব ও দশহাজার পদাতিক নিয়ে শাহজাহানকে মোকাবেলা করার জন্য উদ্ধতভাবে এগিয়ে আসেন। শাহজাদার সাথে কেবলমাত্র তিন বা চারশত অশ্ব ছিল। তবে তাদের উপর হামলা চালাতে ভয় পেয়ে শরীফুল মুল্ক নগরীর দুর্গে ঢুকে যান। পরে দুর্গটি তিনি কিছু সংস্কার করেন, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে নেন। মহাশক্তিশালী প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বহু কামান বসানো হয় এবং বাছাইকরা সৈন্যদেরকে বুরুজগুলোতে মোতায়েন করা হয়। শাহজাহান দুর্গটির উপর কোন ধরনের হামলা চালাতে তাঁর লোকজনকে নিষেধ করেন এবং তাঁর অভিপ্রায় ছিল দুর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতেও যাতে তাঁর পক্ষের কোন প্রাণসংহার না হয়। তাঁর নিষেধে কর্ণপাত না করে তাঁর সাহসী অনুসারীদের একটি দল হামলা চালায়, কিন্তু দুর্গটি শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়েছিল এবং সেখান থেকে নিক্ষিপ্ত গোলাগুলোও ছিল খুবই ভারী, তাই তারা পিছু হটে। কিছুদিন পর শাহজাদার আরেকটি দল তাদের উৎসাহ চেপে রাখতে না পেরে আবারো হামলা চালায়। দুর্গটির চারপাশের মাটি ছিল সমতল ও উন্মুক্তপ্রান্তর, সেখানে কোন টিলা বা টিবি, একটি দেয়াল, একটি গাছ বা কোন ধরনের আশ্রয়ের ব্যবস্থা ছিল না। তাই তারা (শাহজাহানের সৈন্যরা) ঢালগুলো তাদের সামনে রেখে দ্রুত সামনের দিকে এগুচ্ছিল। তারা একটি প্রশস্ত ও গভীর খাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়, খাদটি ছিল পানিতে পূর্ণ। এ অবস্থায় তাদের এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং পিছিয়ে যাওয়া তার চেয়েও বেশী অসম্ভব ছিল। তাদেরকে ডেকে আনার জন্য শাহজাহান লোক পাঠান, কিন্তু তারা ফিরে যায়নি। শাহজাদার কিছু একান্ত অনুগত কর্মচারী তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য যায়, কিন্তু তারাও সেখানে গিয়ে অবস্থানরতদের সাথে যোগ দেয় এবং ফিরে না গিয়ে মৃত্যুর পথকেই বেছে নেয়।

শাহজাহানকে পারস্য গমনে বাধা দেয়ার জন্য অনেক ঘটনা এ সময় ঘটে। শাহজাদা পারভেজ ভয়াবহ রকমের অসুস্থ ছিলেন এবং থাট্টা দখল করার প্রচেষ্টা দৃশ্যতঃ নিস্ফল হয়েছে, এমতাবস্থায় তিনি (শাহজাহান) গুজরাট ও বিহারের[২০] পথ ধরে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যাবার স্থিরসিদ্ধান্ত নেন। দুর্বল ও অসুস্থ হবার কারণে তিনি একটি পাল্কীতে ভ্রমণ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। এসময় তিনি শাহজাদা পারভেজের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে পথচলার গতি বাড়িয়ে দেন। গজনীর মাহমুদ সোমনাথ জয় করার জন্য যে পথ ধরেছিলেন তিনিও সেই পথ ধরেন। রাজপিপলিয়া অতিক্রম করার সময় তিনি দাক্ষিণাত্যের নাসিক তিরবাংয়ে পৌঁছেন, এখানে তিনি তাঁর মালামাল ও সাজ সরঞ্জাম রেখে গিয়েছিলেন।

দাক্ষিণাত্য

মালিক আম্বরের পুত্র ফতেহ খানের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজাম-উল মুল্‌ক কিছু শত্রুতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাই লশকর খানকে বুরহানপুরের দায়িত্বে রেখে খান জাহান সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার লক্ষ্যে খিরকির দিকে কুচ করেন। নিজাম-উল মুল্‌ক ছিলেন দৌলতাবাদ দুর্গে। তিনি একজন হাবশী ক্রীতদাস হামিদ খানকে সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি করেছিলেন এবং তাঁর রাজ্যের সাধারণ ব্যবস্থাপনা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এই লোক নিজাম-উল মুল্‌কের প্রাসাদের অন্তঃপুরের এক দরিদ্র মহিলা কর্মচারীকে বিয়ে করেছিলেন। এই মহিলা নিজাম-উল মুল্‌কে গোপনে মদ সরবরাহ করতেন। এছাড়াও তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্নজনের স্ত্রী ও কন্যাদের এনে দিতেন। এভাবে এই মহিলা নিজাম উল মুল্‌কের মন জয় করে অন্তঃপুরে উচ্চপদ বাগিয়ে নিয়ে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। বাইরে তার স্বামী হামিদ খান সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। তবে হামিদ খান সক্ষম মানুষ ছিলেন। নিজাম-উল মুল্‌ক খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মত তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন, বাইরে হাবশীর দ্বারা এবং ভিতরে তার স্ত্রীর দ্বারা।

খান জাহান কাছাকাছি চলে এসেছেন বলে জেনে হামিদ খান তিনলাখ হুনস নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে যান। টাকা নিয়ে হাবশীর এই ছল ও প্রলোভন খান জাহানকে তাঁর ন্যায়পথ থেকে সরিয়ে দেয়। তিনি টাকাটা গ্রহণ করতে এবং আহমদ নগরের দুর্গ পর্যন্ত বালাঘাটের এই পুরো দেশ নিজাম-উল মুল্‌কের উপর পুনরায় ছেড়ে দিতে রাজি হন। অপমান বর্ষিত হোক সেই বেঈমান লোকটার ওপর, যিনি তাঁর কর্তব্য ও আনুগত্য ভুলে গিয়ে এই ধরনের একটি ভূখণ্ড তিনলাখ হুনসের বিনিময়ে বিকিয়ে দিলেন! খান জাহান বিভিন্ন ঘাঁটির অধিনায়কদের কাছে পত্র লিখে ঘাঁটিগুলো নিজাম-উল মুল্‌কের কর্মকর্তাদের কাছে ছেড়ে দেবার এবং দরবারে ফিরে চলার আদেশ দেন।



সম্রাট আকবরের সমাধি পরিদর্শনে জাহাঙ্গীর।

এই ধরনের একটি পত্র দেয়া হয়েছিল আহমদ নগরের অধিনায়ক সিপাহদার খানের কাছে। নিজাম-উল মুল্‌কের কর্মকর্তারা যখন তাঁর কাছে যান, তখন খান বলেন, "দেশটির দখল নিন, কারণ এটা আপনাদেরই দেশ, কিন্তু আমি রাজকীয় ফরমান ছাড়া দুর্গটি আপনাদের হাতে তুলে দেব না।" নিজাম-উল মুল্‌কের প্রতিনিধিরা তাঁকে রাজি করানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তিনি তাঁর স্থিরসিদ্ধান্ত থেকে কখনোই সরে আসেননি। তিনি সাজসরঞ্জাম দুর্গের বিভিন্নস্থানে স্থাপনের কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখেন এবং দুর্গটিকে সুরক্ষিত করে তোলেন। অন্যান্য অধিনায়করা খান জাহানের নির্দেশে বালাঘাট দেশটি দুর্বলের মত সমর্পণ করে দেয় এবং বুরহানপুর ফিরে যায়।

এই সময় মরহুম সম্রাট আকবরের আমলের অন্যতম মহান আমীর বৈরাম খানের পুত্র খান-খানান ৭২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি সম্মানজনক খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিজয়সমূহ অর্জন করেছিলেন।

থাট্টা অভিমুখী রাস্তা থেকে ফিরে গিয়ে মহাব্বত খান তাঁর কাছে আগমনরত ধনসম্ভারবাহী পশুটানা গাড়ীগুলোর সাথে মিলিত হবার জন্য তাঁর লোকদেরকে

প্রেরণ করেন। তাদেরকে বলে দেয়া হয়, তারা পারলে সেই গাড়ীগুলো তাঁর কাছে নিয়ে আসবে, নইলে সেগুলোকে রাজকীয় ভূখণ্ডের বাইরে নিয়ে যাবে। তিনি নিজেকে কিছুদিন রাণাদের দেশের পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন এবং তাঁর অনুশোচনা[২১] জানানোর জন্য শাহজাহানের কাছে লোক পাঠান। শাহজাদা দয়ার সাথে তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনা গ্রহণ করেন, তাঁর সামনে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে ব্যাপক আনুকূল্য ও দয়া দেখান।[২২]

সম্রাটের রাজত্বের বাইশতম বৎসর

কাশ্মীর অবস্থানকালে সম্রাটের অসুস্থতা বেড়ে যায় এবং প্রতিদিন তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়তে সক্ষম হচ্ছিলেন না, তাই তাঁকে পাল্কীতে বহন করা হচ্ছিল। তিনি সাংঘাতিকভাবে ভুগছিলেন। তিনি খাদ্যের ক্ষুধা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং আফিম প্রত্যাখ্যান করছিলেন, অথচ এটা ছিল বিগত চল্লিশ বছর ধরে তাঁর সঙ্গী। সামান্য কয়েক কাপ আঙুরের মদ ছাড়া তিনি আর কিছুই গ্রহণ করছিলেন না।

এই সময় দুর্ভাগ্যবশতঃ সুলতান শাহরিয়ার অসুস্থ হয়ে পড়েন। 'শৃগালের রোগ'[২৩] তাঁর মান-সম্মান কেড়ে নিচ্ছিল। তাঁর সমস্ত কেশ, দাড়ি, ভুরু ও চোখের পাতার লোম ঝরে গিয়েছিল। চিকিৎসকদের পথ্যাদিতে কোন ফল পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই তিনি লজ্জাঢাকা হয়ে লাহোরে ফিরে যান।

সম্রাটের মৃত্যু

সম্রাটও লাহোরে ফিরে যাবার যাত্রা শুরু করেন। তিনি যখন বৈরাম কালাতে পৌছেন, তখন খেলাধুলার প্রতি তাঁর অনুরাগ পুনঃজাগরিত হয়। মহামান্য সম্রাট যেখানটায় বসে ছিলেন গ্রামের লোকেরা তার কাছেই হরিণ ছেড়ে দেয়। তিনি তাঁর ছোট্ট বন্দুক তুলে নেন এবং গুলি করেন। গুলি খাওয়া হরিণটি ছুটে তাঁর হরিণীর কাছে গিয়ে পড়ে যায়। এক লোক এটিকে তাড়া করতে গিয়ে একটি খাড়া জায়গায় পড়ে যায় এবং প্রাণ হারায়। দরিদ্র লোকটির এই দুর্ভাগ্য সম্রাটকে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর মনে হচ্ছিল যেন তিনি মৃত্যুর ফেরেশতাকে (আজরাইল আলাইহিস সালাম) দেখতে পেয়েছেন। সেই থেকে তিনি বিশ্রাম নিতেও পারছিলেন না, সুস্থিরও হতে পারছিলেন না এবং তাঁর অবস্থা পুরোপুরি বদলে গিয়েছিল। পথচলা (সম্রাটের বহরের) দুই মঞ্জিল[২৪] পর্যন্ত চলতে থাকে। দিনের শেষের দিকে তিনি সেখান থেকে আবার রওনা দেন। পথিমধ্যে তিনি এক পাত্র মদ দেবার জন্য বলেন কিন্তু তিনি তা তাঁর ঠোঁটে ছোঁয়ালেও কোনভাবেই গিলতে পারছিলেন না। রাতের দিকে তাঁর অবস্থা চরম খারাপ হয়ে পড়ে এবং তিনি পরদিন সকালে মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনটি ছিল তাঁর রাজত্বের ২২তম বছরের ২৮শে সফর, ১০৩৭ হিজরী (১৬২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস)।

খান-ই আজম (ইরাদত খান)-এর সাথে একমত হয়ে আসফ খান ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ গিয়ে খসরু (শাহজাদা)'র পুত্র দাওয়ার বক্‌শকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন এবং তাঁর সম্রাট হবার সম্ভাবনার কথা তাঁকে জানান। কিন্তু তিনি তাঁদের কথা বিশ্বাস করেননি এবং তাঁরা কঠোর শপথে আবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁদের প্রস্তাবকে আস্থার মধ্যে নেননি। তাঁরা তাঁকে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার করেন, রাজকীয় শামিয়ানা উত্তোলন করেন এবং রাজকীয় আবাসের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। নূরজাহান বেগম তাঁর ভাইকে তাঁর কাছে ডেকে আনার জন্য বহু লোককে পাঠান, কিন্তু তিনি নানান অজুহাত দেখান এবং যাননি। এসময় জাহাঙ্গীরের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে আসফ খান একজন দ্রুতগামী ডাক হরকরা বেনারসীকে শাহজাহানের কাছে পাঠান এবং যেহেতু লেখার সময় ছিলনা তাই তিনি (আসফ খান) তাঁর ছোট সীলমোহর আংটিটিও খবরের নিশ্চয়তার প্রমাণসরূপ পাঠিয়ে দেন। পরদিন পার্বত্যাঞ্চল থেকে ভিমবারে রাজকীয় অনুচরবর্গ (দাওয়ারকে নিয়ে) উপস্থিত হয়। সেখানে সম্রাটের নামাজে জানাযা

অনুষ্ঠিত হয় এবং লাশ প্রহরা সহকারে লাহোরে পাঠিয়ে দেয়া হয়, সেখানে নূরজাহানের তৈরী করা একটি বাগানে (সহদরায়) লাশ দাফন করা হয়।



শাহাজাদা খসরু শাহাজাদা দানিয়েল। মোরগের

যখন রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তি (আমীর) ও কর্মকর্তারা অবগত হলেন যে, শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণ নিরাপদ করার লক্ষ্যেই দাওয়ার বক্‌শকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করার কৌশল অবলম্বন করছেন আসফ খান এবং দাওয়ার কেবলই বলির পাঠা, তখন তাঁরা আসফ খানকে সমর্থন দেন এবং তিনি যা বলেন তাঁরাও সেমতে কাজ করেন।[২৫] অতঃপর ভিমবারের কাছে দাওয়ার বক্‌শের নামে খুৎবা পাঠ করা হয় এবং এরপর তাঁরা লাহোরের দিকে রওনা দেন। নূরজাহানের ব্যাপারে আসফ খান স্বস্তিতে ছিলেন না তাই তিনি তাঁর উপর নজর রাখেন এবং তাঁর যোগাযোগের সমস্ত সুযোগ বন্ধ করে দেন। বেগমের ইচ্ছা ছিল শাহরিয়ারকে সিংহাসনে বসানোর। সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ শোনারকালে শাহরিয়ার লাহোরে ছিলেন এবং তাঁর ষড়যন্ত্রকারী স্ত্রীর আহবানে তিনি রাজকীয় খেতাব গ্রহণ করেন। তিনি লাহোরে থাকা রাজকীয় কোষাগার ও রাজ্যের মালিকানায় যা যা ছিল সবই দখল করে নেন। তাঁর অবস্থান ধরে রাখার জন্য সৈন্য ও সমর্থকদের মন জয়

করতে যে যা চেয়েছে প্রত্যেকের চাওয়া পূরণ করেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে পুরনো ও নতুন আমীরদের মাঝে ৭০ লাখ রূপী বিতরণ করেন। সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ শুনে মরহুম দানিয়েলের পুত্র মীর্জা বাইসিংঘার পালিয়ে লাহোর চলে আসেন এবং শাহরিয়ারের সাথে যোগ দেন। তিনি সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে নিয়ে নদীর ওপাড়ে চলে যান।

ওপাড়ে আসফ খান এগিয়ে আসছিলেন, দাওয়ার বক্‌শ একটি হাতির পিঠে এবং তিনি আরেকটির পিঠে ছিলেন। এভাবে তাঁরা লড়ার জন্য কুচ করে আসছিলেন এবং লাহোরের তিনক্রোশের মত দূরে বিরোধী বাহিনীর সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। প্রথম আক্রমণের চোটেই শাহরিয়ারের ভাড়া করা সৈন্যরা রাজ্যের পুরনো ও অনুগত কর্মচারীদের মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং পালিয়ে যায়। শাহরিয়ার ঘটনার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য দুই বা তিনহাজার অশ্বারোহী নিয়ে লাহোরের কাছাকাছি অপেক্ষা করছিলেন। এক তুর্কী ক্রীতদাস তাঁকে পলায়নের পথ সম্পর্কে খবর দেয়। শাহরিয়ার তাঁর অবস্থান ও বিপদ সম্পর্কে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে পিছনের দিকে গিয়ে দুর্গে ঢুকে পড়েন। আর এভাবে নিজেই বিপদে নিজের পা আটকে দেন। পরদিন আমীররা এসে উপস্থিত হন এবং দুর্গের সামনে বসে থাকেন। তাঁর (শাহরিয়ারের) কিছু অনুসারী আসফ খানের সাথে দেখা করেন এবং দুর্গ তুলে দেবার কিছু শর্ত ঠিক করেন। রাতের বেলা আজম খান দুর্গে প্রবেশ করেন এবং পরদিন সকালে অন্য আমীরদেরকে প্রবেশ করতে দেন। শাহরিয়ার পালিয়ে আশ্রয় নেবার জন্য মরহুম সম্রাটের নারীমহলে ঢুকে পড়েন। একজন খোজা তাঁকে বের করে আনেন এবং তাঁকে দাওয়ার বক্‌শের সামনে হাজির হতে বাধ্য করা হয়। নিয়মমত কুর্নিশ ও আনুগত্যসরূপ সম্মান জানানোর পর তাঁকে বন্দী করে রাখা হয় এবং দুই বা তিনদিন পর তাঁকে অন্ধ করে দেয়া হয়। শাহজাদা দানিয়েলের পুত্র তাহমুরাস ও হোশাংকেও নিয়ে গিয়ে বন্দী করা হয়। আসফ খান পত্র লিখে শাহজাহানকে তাঁর বিজয়ের (শাহরিয়ারের পরাজয়ের) খবর দেন।

ডাক হরকরা বেনারসী কাশ্মীরের পার্বত্যাঞ্চলের জঙ্গঝাটি ত্যাগ করেন এবং বিশ দিনের মধ্যে ১৯শে রবিউল আউয়াল ১০৩৭ হিজরী নিজাম-উল মুল্‌কের সীমান্ত জানিরে পৌঁছেন। ডাক হরকরা মহাব্বত খানের আবাসে চলে যান। মহাব্বত খানকে তার কিছু আগে শাহজাহান গ্রহণ করেছিলেন। মহাব্বত খান শাহজাদা (শাহজাহান)'র ব্যক্তিগত কামরায় খবর পাঠালে তিনি বেরিয়ে আসেন এবং ডাক হরকরার কাছ থেকে আসফ খান প্রেরিত ছোট সীলমোহর আংটিটি গ্রহণ করেন। শোকের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে পালন করার পর তিনি ২৩শে রবিউল আউয়াল তাঁর যাত্রা শুরু করেন এবং গুজরাটের পথ ধরে এগিয়ে যান।[২৬]



আজমীরে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির ওরশে সম্রাট জাহাঙ্গীর।

নিজাম-উল মুল্‌কের সাথে চুক্তি ও বালাঘাট ভূখণ্ডটি তাঁকে সমর্পণের পর খান-জাহান বুরহানপুরে বেশীরভাগ জায়গীরদার ও আমীরদের সাথে মিলিত হন। আহমদনগরে সিপাহদার খান প্রত্যাখ্যান করেন খান-জাহানের নেতৃত্ব এবং নিজাম-উল মুল্‌কের কর্মকর্তাদের দাবী সমুহ। সিপাহদার খান দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে জানিয়ে দেন যে, তিনি রাজকীয় আদেশনামা ছাড়া দুর্গ ছাড়বেন না, এমনকি এতে যদি তাঁর মাথাও চলে যায় যাক। বুরহানাবাদে দরিয়া রোহিল্লা এবং অন্যান্যরা খান-জাহানের সাথে যোগ দেন। তখন তিনি মাণ্ডুর দিকে রওনা দেন এবং মালওয়ার বহু এলাকা দখল করে নেন। এরপর তিনি বুরহানপুর ফিরে যান।

ইয়ামিন-উদ দৌলা আসফ খানের কাছে শাহজাহান এই মর্মে একটি ফরমান পাঠান যে, খসরু (শাহজাদা)'র পুত্র দাওয়ার বক্‌শ ও অকেজো ভাই (শাহরিয়ার) এবং শাহজাদা দানিয়েলের পুত্রদেরকে পরপারে পাঠিয়ে দেয়া হলে সেটাই ভালো

হবে। ১০৩৭ হিজরীর ২রা জমাদিউল আউয়াল অনুসারে ১০ই বাহমান জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ২২তম বছরে লাহোরে সাধারণ সম্মতিক্রমে শাহজাহানকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং তাঁর নামে খুৎবা পাঠ করা হয়। গোলযোগ প্রতিরোধ করার জন্য শাহজাহানের সমর্থকরা যাঁকে ক্ষমতায় বসানো যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেছিলেন, সেই দাওয়ার বক্‌শকে এ সময় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ২৬শে জমাদিউল আউয়াল দাওয়ার[২৭]; তাঁর ভাই গারশাস্প, শাহরিয়ার এবং মরহুম শাহজাদা দানিয়েলের পুত্র তাহমুরাস ও হোশাংকে মেরে ফেলা হয়।

রাণার সীমান্তে পৌঁছে শাহজাহান কোকান্দায় রাণা করণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, রাণা এবং তাঁর পিতা রাণা অমর সিং ব্যাপকভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করেন। তিনি শ্রদ্ধার্ঘ (সম্মান জানিয়ে রাজস্ব) নিবেদন করেন এবং মহান উপহারাদি ও সম্মান লাভ করেন। এসময় নয়া সম্রাট তাঁর আটত্রিশতম জন্মদিন উদযাপন করেন। ১৯শে জমাদিউল আউয়াল তিনি আজমীর পৌঁছেন এবং মহান পূর্বপুরুষদের অনুকরণে খালি পায়ে মহান সাধকের মাজার জেয়ারত করেন। সৈন্যবাহিনীর প্রধান মহাব্বত খান আকুল মিনতি জানিয়ে আজমীর জায়গীর হিসাবে পান। ২৬শে জমাদিউল আউয়াল শাহজাহান আগ্রায় পৌঁছেন এবং বাগানের বাইরে তাঁবু স্থাপন করেন। পরদিন তিনি নগরীতে প্রবেশ করেন এবং সার্বজনীনভাবে রাজা হিসাবে স্বীকৃতি পান।

টীকা

১) খসরু ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র এবং রাজা মান সিং এর ভাগ্নে। সম্রাট আকবর যখন মৃত্যুশয্যায় তখন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কেউ কেউ জোট গঠন করে খসরুকে আকবরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। সেই থেকে জাহাঙ্গীরের প্রতি খসরুর অবাধ্যতার শুরু। জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের পর খসরু বিদ্রোহ করেন এবং সম্রাটের বাহিনীর সাথে বিভিন্নস্থানে যুদ্ধে লিপ্ত হন। অবশেষে খসরু ধরা পড়েন। তার হাত-পা শিকলে বেঁধে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। তাঁর মদদদাতাদের অনেককে হত্যা করা হয়। খসরুর বিদ্রোহ সম্পর্কে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর তুজুকে লিখেছেন, "তারুণ্যের প্রভাবে খসরুর মনে কতগুলি অসার ধারণা ও অলীক কল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল। যৌবনমদে মত্ততা ও অভিজ্ঞতার অভাবে এবং কতগুলি অপদার্থ সঙ্গী-সাথীদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিহীনতার ফলে, বিশেষকরে আমার পিতার অসুস্থতার ফলেই ঘটেছিল এই ঘটনা। সেই অদূরদর্শীরা অজস্র অজস্র অন্যায় অপরাধের জন্য ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভেরও অযোগ্য হয়েছিল। তারা কল্পনা করেছিল যে, খসরুকে ক্রীড়নক করে হয়ত নিজেরাই তার মাধ্যমে রাজ্য শাসনের সুযোগ পাবে। একটি খাঁটি সত্য তাদের কাছে ধরা পড়েনি যে, সাম্রাজ্য শাসন ও সার্বভৌমত্ব ক্রটিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি, অসার কল্পনা ও নিরর্থক চেষ্টা দ্বারা লাভ করা যায় না।" সম্রাট আরো বলছেন, "আমার রাজত্বের প্রথমবর্ষে জিলহজ্ব মাসের আট তারিখ (৬ই এপ্রিল, ১৬০৫) রবিবার রাত দু'টার পরে খসরু পরলোকগত সম্রাট আকবরের মকবরা জেয়ারত করতে যাবার একটা ভান করলেন। আর তিনি তাঁর প্রতি অনুরক্ত তিনশত পঞ্চাশ জন অশ্বারোহীসহ আগ্রা দুর্গের বাইরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ওয়াজির-উল মুলকের সাথে পরিচিত জনৈক মশালচী (আলোরক্ষক) এসে আমাকে খসরুর পলায়নের খবরটি দিয়েছিলেন।" তুজুক থেকে জানা যায়, খসরুর বিদ্রোহের ঠিক এক মাস পর খসরুর মাতা (মানসিং এর ভগ্নী) অতিরিক্ত আফিম সেবন করে আত্মহত্যা করেন। খসরুর শাস্তি সম্পর্কে সম্রাট জাহাঙ্গীর বলেন, "...... চরম দুর্দশার মধ্যে সে বন্দী হল।

বিশ্বস্ত ও অনুগত রাজপুত্রের সম্মান ও মর্যাদা থেকে সে অবনমিত হল চিরকালের বন্দী জীবনে।" খসরু ও তাঁর সহযোগীদের পরিণতি সম্পর্কে সম্রাটের তুজুকে আরো বলা হয়েছে, "সেনাপতিরা মীর্জা কামরানের বাগানে খসরুকে আমার সামনে এনে হাজির করলেন। তার দু'টি হাত ছিল বাঁধা, পা দু'খানি বাঁ দিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ। আর তা আবদ্ধ করা হয়েছিল চেঙ্গিজ খানের নীতি পদ্ধতি অনুসারে। তাঁরা হোসেন বেগকে নিয়ে এলেন খসরুর ডান পাশে,



সম্রাট জাহাঙ্গীরকে উপহার দিচ্ছেন
খান-ই-খানান আব্দুর রহীম খান।

আর আব্দুর রহীমকে বাঁ দিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মাঝখানে দাঁড়িয়ে খসরু ভয়ে কম্পমান হয়ে ক্রন্দন করে চলছিল। ....খসরুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখতে নির্দেশ দিয়ে ওদের দু'জনকে বৃষ ও গর্দভের চর্মদ্বারা আবৃত করে রাখতে হুকুম দিলাম। আরও বললাম, যে পশুচর্মে ওদের দেহ আবৃত

হবে সেই চামড়ার সাথে পশুর মাথা ও লেজ অটুট রেখে তা সুদ্ধই তাদের গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরময় ঘোরানো হবে। বৃষ চর্ম দ্রুত শুকিয়ে যায়, গাধার চামড়া তত তাড়াতাড়ি শুকায় না। হোসেন বেগ রাতের চার প্রহর পরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আব্দুর রহীম আবদ্ধ ছিলেন গাধার চামড়ার মধ্যে। তাকে বাইরে থেকে খাদ্য-পানীয় দেয়া হয়েছিল বলে তিনি বেঁচে ছিলেন। ...সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আমি হুকুম দিলাম শহরের উদ্যানটি থেকে রাস্তার দু'ধারে খুঁটি পুঁতে সেখানে রাজদ্রোহী আইমাকদের ও অন্যান্য সব বিদ্রোহীকে ফাঁসি দেয়া ও শূলে চড়ানো হোক।"

২) দেশটি ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দু অধ্যুষিত বিধায় এখানকার হিন্দুদের প্রাচীন গ্রন্থগুলোর প্রসঙ্গ টানা হয়েছে।

৩) ভীম তখন এলাহাবাদের পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থান করছিলেন বলে অপর একটি সমকালীন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪) রোহতাস দুর্গে শাহজাহান তিনদিন অবস্থান করেছিলেন।

৫) সম্রাট এ সময় কাশ্মীর থেকে লাহোর এসে পৌঁছেছিলেন।

৬) অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থ বলছে যে, শাহজাহান ঐসময় পিতার কাছে ক্ষমা চান এবং ক্ষমা পান। এখানে উল্লেখ্য যে, শাহজাহান সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ১৭তম বর্ষে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। মূলতঃ সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ এবং তাঁর পুত্র শাহরিয়ারকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের উত্তরাধিকারী করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর বিদ্রোহ। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে এই বিদ্রোহের শুরুর দিকটা সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে।

৭) অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থ বলছে, ১০৩৫ হিজরীর মহররমের শেষ দিন লাহোর অবস্থানকালে সম্রাট খান-খানানের জন্য দুই লাখ রুপী পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৮) নূরজাহানের ভাই।

৯) মহাব্বত খান সম্রাটের অনুমতি নেননি, আবার মহাব্বত খানের মত একজন প্রভাবশালী এবং বিদ্রোহভাবাপন্ন সেনাপতির কন্যাকে বিয়ে করার জন্য খাজা ওমর নকশবন্দীর পরিবারও সম্রাটের কাছ থেকে অনুমতি নেননি – এটাই এত কঠোর ব্যবহারের কারণ।

১০) অর্থ্যাৎ মহাব্বত খান সম্রাটকে জিম্মি করে সেখান থেকে নিরাপদে পালাতে চান। মহাব্বত খানের দলের অগ্রভাগে থাকবেন সম্রাট এবং তিনি ঘোষণা করবেন যে, তিনি শিকারে বা ভ্রমণে যাচ্ছেন।

১১) মাইলস্টোন।

১২) সম্রাটকে জিম্মি করে মহাব্বত খান কাবুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহাব্বত খান এর আগে দীর্ঘদিন কাবুলের মনসবদারীর দায়িত্বে ছিলেন। তিনি নিজেও সেখানকার লোক। তাঁর পুত্ররাও বড় বড় দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কাবুলে তাঁদের অধীনে সৈন্য সংখ্যাও ছিল প্রচুর। মহাব্বত খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহপ্রাপ্তদের অন্যতম। তিনি সম্রাটের বিশ্বস্ত ও ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে মহাব্বত খান ও তাঁর পুত্রদেরকে নানাভাবে অনুগ্রহ করার বহু উল্লেখ রয়েছে।

১৩) এই ঘটনায় সম্রাট জাহাঙ্গীর জিম্মিদশা থেকে মুক্ত হন।

১৪) নূরজাহান বেগম কখন সম্রাটের সাথে যোগ দিয়েছিলেন তা এই গ্রন্থের রচয়িতা উল্লেখ করেননি। তবে সম্রাট কর্তৃক পারস্য রাজ শাহ ইসমাঈলের সাথে সাক্ষাত করতে যাবার ব্যাপারটি অস্বাভাবিক। ইনি অন্যকোন শাহ ইসমাঈল কিনা বুঝা যাচ্ছে না। কারণ পারস্যের শাহ ইসমাঈল অনেক আগে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে পারস্যে শাহ আব্বাস ক্ষমতাসীন ছিলেন।

১৫) সম্ভবতঃ মাথায় প্রচণ্ড বেদনা।

১৬) shoot.

১৭) তৎকালে রচিত আরেকটি স্মৃতিকথা 'তাতিম্মা-ই ওয়াকিয়াত-ই জাহাঙ্গীরী'তে মোহাম্মদ হাদি এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, 'বুলন্দ খানকে পাঠানোর পর মহাব্বত খানকে সুন্দরভাবে বলার জন্য খাজা আবুল হাসানকে পাঠানো হয়। মহাব্বত খান সম্রাটের কথা অনুযায়ী কাজ করেন এবং প্রতিদিনকার মত সেদিন সম্রাটের সামনে আসা থেকে বিরত থাকেন। পরদিন সম্রাটের তাঁবুর সামনে সম্রাটের অনুগত বেশকিছু সংখ্যক লোকজন সমবেত হয়। তখন মহাব্বত খানকে বলা হয় যে, সম্রাট বের হবেন, তিনি (মহাব্বত খান) যেন অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে আগেভাগে বেরিয়ে পড়েন। কি ঘটতে যাচ্ছে তা বুঝতে পারলেও ইতিপূর্বে আহাদীদের সাথে লড়াইয়ের ব্যাপারটার কথা মনে থাকায় মহাব্বত খান সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন। এরপর সম্রাট বেরিয়ে পড়েন এবং সামনে চলতে থাকেন। মহাব্বত খান প্রথম বিশ্রামের স্থানে অবস্থান করছিলেন কিন্তু সম্রাট এগিয়ে যাওয়ায় তিনিও আবার সেখান থেকে পিছু পিছু রওনা দেন।' এভাবে সম্রাট তাঁর হাত থেকে ফস্‌কে বেরিয়ে যান।

১৮) আটাক দুর্গের যুদ্ধের পর থেকে তাঁরা মহাব্বত খানের হাতে বন্দী ছিলেন।

১৯) মালিক আম্বরের সাথে ইনিও বিদ্রোহী শাহজাহানের দলভূক্ত হয়েছিলেন।

২০) স্থানটি প্রকৃতপক্ষে বেরার হতে পারে।

২১) ইতিপূর্বে শাহজাহানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার কারণে এই অনুতাপ।

২২) তাতিম্মাতে উল্লেখ রয়েছে, মহাব্বত খান তখন দুই হাজারের মত অশ্ব নিয়ে শাহজাহানের সাথে যোগ দেন।

২৩) ঝলসানো বা কেশ ঝরে যাওয়া রোগ।

২৪) two marches.

২৫) সম্রাটের মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ করার জন্য যেকোন একজন রাজপুত্র এগিয়ে আসতো। কিন্তু আসফ খান চাইছিলেন শাহজাহানকে। যেহেতু শাহজাহান তখন দূরে ছিলেন তাই দাওয়ার বক্‌শকে অস্থায়ী ভিত্তিতে শূন্য মসনদে বসিয়ে কেবলই পদটি শূন্য থাকা থেকে রক্ষা এবং শাহজাহান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হচ্ছিল।

২৬) দাক্ষিণাত্যের নিজাম খান-জাহান লোদীর কাছ থেকে কোন খবরা খবর না পাওয়ায় তিনি গুজরাটের রাস্তা ধরেছিলেন।

২৭) দাওয়ারের অপর নাম ছিল বুলাকি। 'বাদশাহনামা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, বুলাকিকে নিরাপদে আটক রাখা হয়েছিল। এলফিনস্টোন বলছেন, দাওয়ার পালিয়ে পারস্যে চলে গিয়েছিলেন সেখানে ১৬৩৩ সালেও তাঁকে দেখা গেছে।



Iqbalnama-e-Jahangiri
Written by Mu'tamad Khan
Transtaled by Mohammad Mamunur **Rashid**
Published by Mohd. Liaquatullah
Cover Design: Shahidul Islam Rony
www.studentways.info

a student ways
publication

ISBN: 978-984-406-657-3

978 984 406 657 3